বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী

ক্রেনিয়াল

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

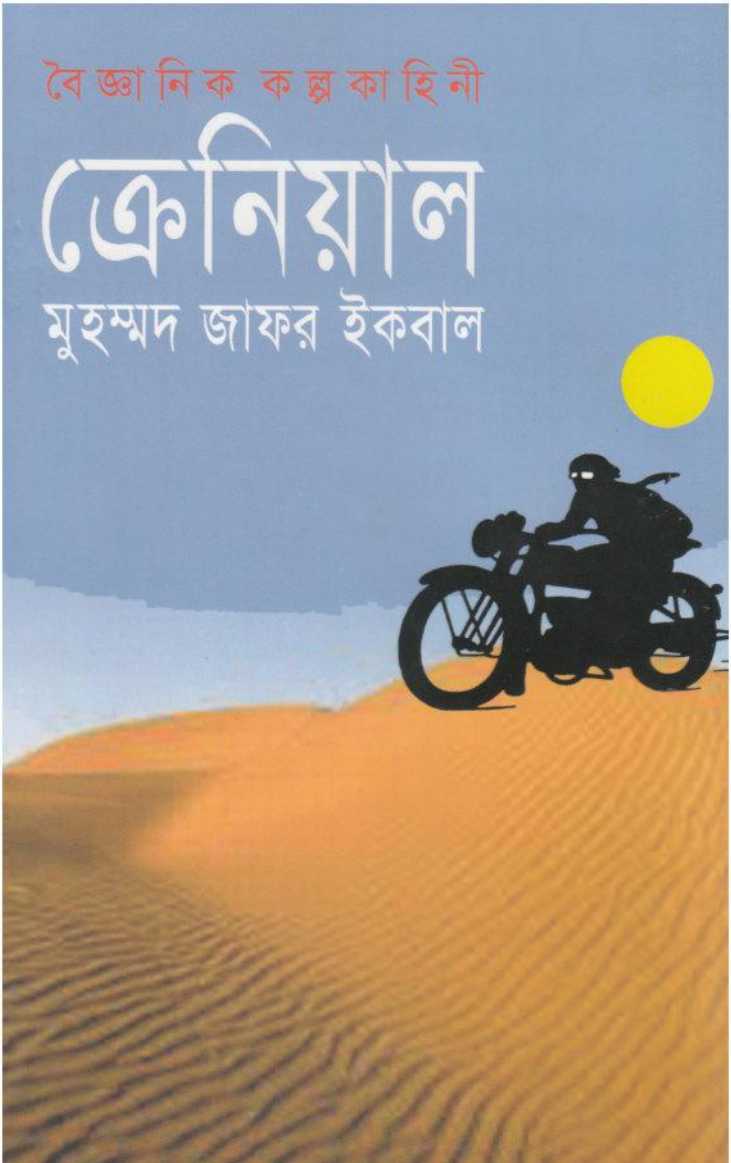

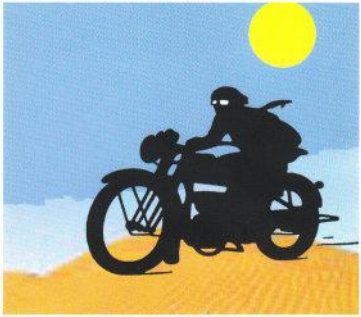

কোয়ান্টাম কম্পিউটার যুগে মানবসভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেছে আত্মঘাতী নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণে। বেঁচে আছে অল্পসংখ্যক মানুষ। সেই ধ্বংসস্তূপে তাদের হাত ধরেই শুরু হল সভ্যতার নতুন পথচলা। প্রাচীরঘেরা শহরে শহরে গড়ে উঠল যন্ত্রসর্বস্ব এক অমানবিক জীবনধারা। সেখানে জ্ঞানেবিজ্ঞানে পারদর্শী করে তোলার জন্য মানুষের মাথায় লাগিয়ে দেওয়া হয় ক্রেনিয়াল। কিন্তু সে কেবলই বাধ্য ও অনুগতদের জন্য, যদি কেউ প্রশ্ন করে বসে, তার কিন্তু রেহাই নেই, ডিটিউন করে তার মস্তিষ্ককে অচল করে দেওয়া হয়। মস্তিষ্কহীন যন্ত্রচালিত এই পৃথিবীতে অবাধ্যতার ঢেউ তুলে এগিয়ে এল এক কিশোরী আর এক কিশোর। টিশা আর রিহি। ধুধু মরুপ্রান্তরে শুরু হল তাদের বিপজ্জনক অভিযাত্রা। এই বইটি সেই অভিযাত্রারই রুদ্ধশ্বাস উপাখ্যান। অনাগত ভবিষ্যৎকে নিয়ে এ এক অসাধারণ কল্পকথা।

প্রচ্ছদ আহসান হাবীব

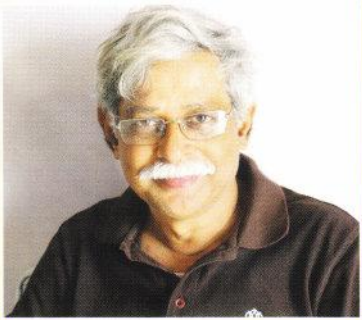

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

জন্ম : ২৩ ডিসেম্বর ১৯৫২, সিলেট। বাবা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ফয়জুর রহমান আহমদ এবং মা আয়েশা আখতার খাতুন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র, পিএইচডি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটন থেকে। ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি এবং বেল কমিউনিকেশান্স রিসার্চে বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করে সুদীর্ঘ আঠার বছর পর দেশে ফিরে এসে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিয়েছেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

স্ত্রী প্রফেসর ড. ইয়াসমীন হক, পুত্র নাবিল এবং কন্যা ইয়েশিম।

আলোকচিত্র : তাসনোভা আদিবা সেঁজুতি

ক্রে নি য়া ল

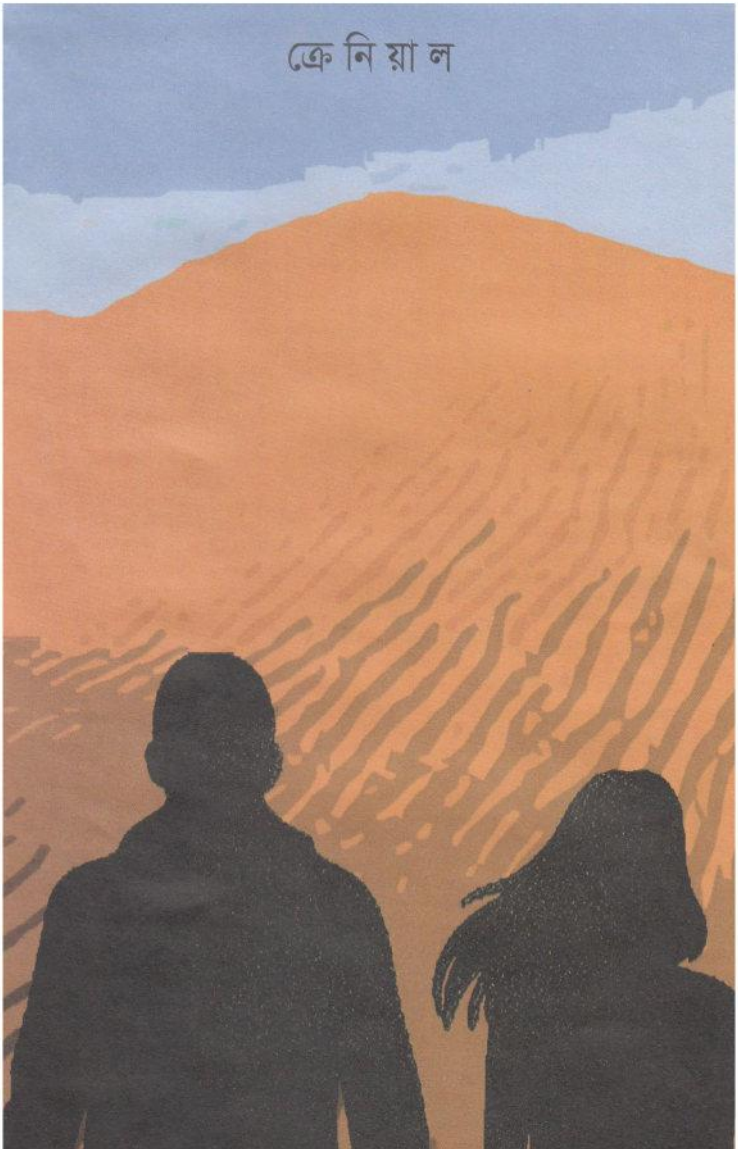

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

গ্রামের নাম কাঁকনডুবি
পদার্থবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ
বাপ্পার বন্ধু
ইস্টিশন
রাশা
শুকনো ফুল রঙিন ফুল
কেপলার টুটুবি
যারা বায়োবট
অবনীল
জলজ
এক টুকরো লাল সবুজ কাপড়
নিউরনে অনুরণন
নিউরনে আবারো অনুরণন
গণিতের মজা মজার গণিত

বৈজ্ঞানিক কল্প কাহিনী

ক্রেনিয়াল

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

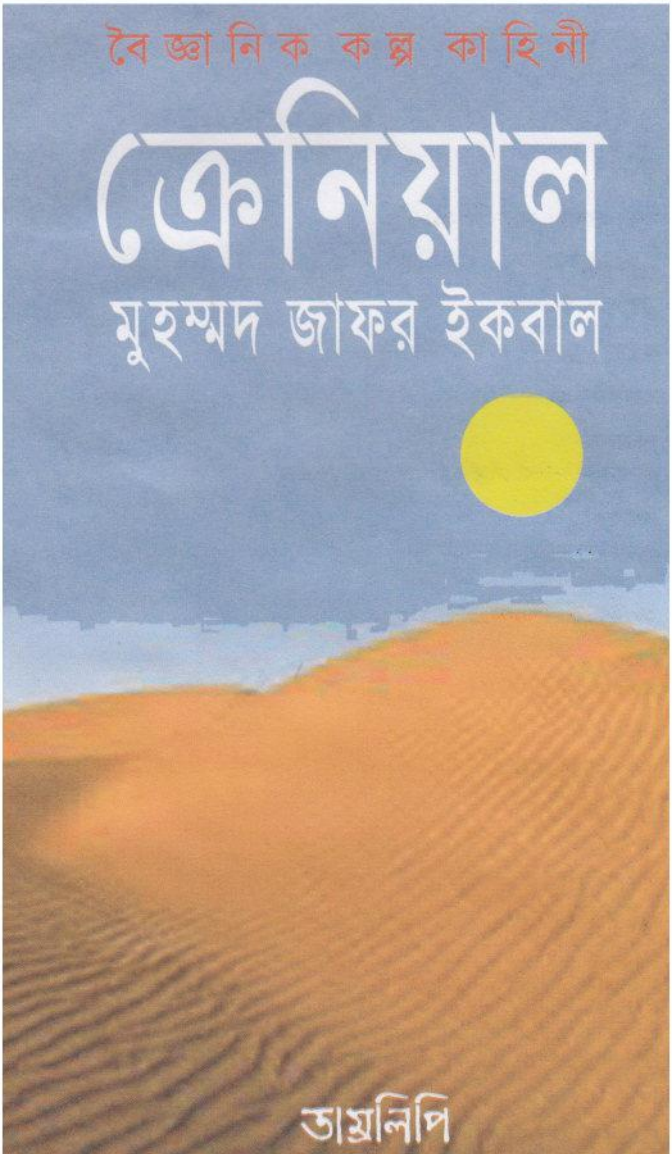

তাম্রলিপি

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৬

ক্রেনিয়াল
মুহম্মদ জাফর ইকবাল

গ্রন্থস্বত্ব : প্রফেসর ড. ইয়াসমীন হক

তাম্রলিপি- ৩২১

পরিচালক
তাসনোভা আদিবা সেঁজুতি

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি
তাম্রলিপি
৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
আহসান হাবীব

কম্পোজ
তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ
জননী প্রিন্টার্স
১৮/২৩ প্রতাপ দাস লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ২৭০.০০

CRANIAL
By : Muhammed Zafar Iqbal
First Published : February 2016, by A K M Tariqul Islam Roni
Director : Tasnova Adiba Shanjute, Tamralipi, 38/2ka, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : 270.00

ISBN : 984-70096-0321-1

উৎসর্গ

ব্যারিস্টার ড. তুরিন আফরোজ
আমার খুব প্রিয় একজন মানুষ।
যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে
তার ভূমিকার কথা বাংলাদেশের
ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

প্রথম পর্ব

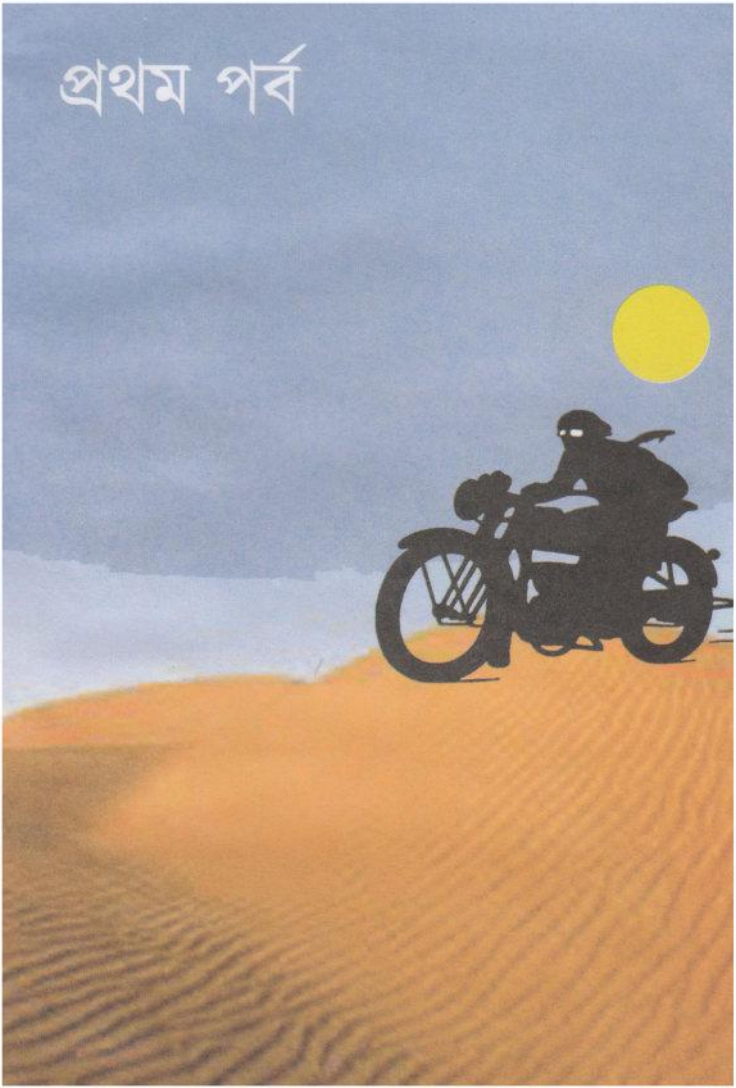

১.

টিশা বড় একটা কংক্রিটের টুকরোর উপর দাঁড়িয়ে বহুদূরে তাকিয়ে থেকে অনেকটা নিজের মনে গুনগুন করে একটা গান গাইছিল। তার গানের গলা অপূর্ব, কিন্তু এখানে দাঁড়ানোর ভঙ্গিটি খুবই বিপজ্জনক, মনে হচ্ছিল যে কোনো মুহূর্তে বুঝি পড়ে যাবে। গান গাইতে গাইতে দূরে তাকিয়ে সে কী দেখছে কে জানে। দেখার কিছু নেই, যতদূর চোখ যায় শুধু লালচে মাটি, পাথর আর উঁচু-নিচু হয়ে থাকা বালিয়াড়ি। টিশা হঠাৎ করে গানটি শেষ করে ফেলল, তখন আমি বললাম, "টিশা সাবধান, পড়ে যাবে কিন্তু!"

আমার কথা শুনে টিশা মনে হয় একটু মজা পেল। তাই আমাকে ভয় দেখানোর জন্য সে বিপজ্জনক ভঙ্গিতেই পাশের কংক্রিটের টুকরোর উপর একটা লাফ দিল। আমি রীতিমতো চমকে উঠলাম, মুহূর্তের জন্য মনে হলো সে বুঝি তাল হারিয়ে পড়ে যাবে। টিশা অবশ্যি পড়ে গেল না, নিজেকে সামলে নিয়ে আবার একটা বিপজ্জনক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হাসতে থাকে। আমি একটু বিস্ময় নিয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকি, তাকে আমি সেই ছেলেবেলা থেকে চিনি, কিন্তু সে যখন এভাবে খিলখিল করে সারা শরীর দুলিয়ে হাসে তখন হঠাৎ করে মনে হয় সে বুঝি টিশা নয়, সে বুঝি অচেনা একটি মেয়ে।

টিশা হাসি থামিয়ে বলল, "তুমি এরকম হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছ কেন?"

টিশার কথা শুনে আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম কিন্তু সেটা বুঝতে দিলাম না, বললাম, "আমি হাঁ করে তাকিয়ে আছি দেখার জন্য তুমি কখন পড়ে যাও—তখন আমার নিচে গিয়ে তোমার শরীরটাকে ঘাড়ে করে টেনে তুলে আনতে হবে।"

টিশা চোখ নাচিয়ে বলল, "তোমার কোনো ভয় নেই রিহি। আমি পড়ে যাব না।"

আমি সাবধানে একটা কংক্রিটের টুকরো থেকে আরেকটা টুকরোয় পা দিয়ে টিশার কাছে এসে দাঁড়ালাম। বাতাসে তার চুল উড়ছে, আমি সেই চুলের মৃদু ঘ্রাণ পেলাম। টিশা হাত তুলে দূরে দেখিয়ে বলল, "আমার সব সময় জানার ইচ্ছা করে ওইখানে কী আছে?"

"কোনখানে?"

টিশা অনির্দিষ্টের মতো হাত নেড়ে বলল, "ওই তো। ওই দূরে।"

আমি বললাম, "কী থাকবে। কিছু নেই। বহুদূরে হয়তো মানুষের আস্তানা আছে। সেখানে আমাদের মতো মানুষ থাকে।"

টিশা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমার খুব জানার ইচ্ছা করে। মাঝে মাঝে আমার কী ইচ্ছা করে জান?"

"কী?"

"একটা মোটর বাইকে করে বাইরে ঘুরে বেড়াই। দেখি কোথায় কী আছে?"

আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, "বল কী তুমি? বাইরে ঘুরে বেড়াবে? তুমি জান না বাইরে দস্যু গিজগিজ করছে। মাটিতে রেডিয়েশান। জন্তু-জানোয়ারের মিউটেশান হয়ে দানব হয়ে গেছে।"

টিশা বলল, "জানি।"

"তাহলে?"

"আমি সব জানি, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "বিশ্বাস কর না?"

টিশা মাথা নাড়ল, "নাহ্।" আমি প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে বললাম, "তুমি জান, তুমি এইসব কথা বলছ জানলে তোমাকে কী করবে?"

"জানি। আমাকে ডিটিউন করে দেবে। আমি তখন কিছু বুঝব না। আমাকে যেটা বলবে সেটা করব। আমাকে দিয়ে শহরের রাস্তা পরিষ্কার করাবে। ময়লা টেনে নেওয়াবে। আরও খারাপ খারাপ জিনিস করাবে।"

"তাহলে?"

টিশা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তাহলে কী?"

"তাহলে এরকম কথা বলছ কেন?"

টিশা হাসার মতো ভঙ্গি করে বলল, "আমি কি কমিউনে বক্তৃতা দিয়ে বলছি? আমি শহরের প্রাচীরের উপর দাঁড়িয়ে তোমাকে বলছি।" টিশা আমার বুকে ঠোকা দিয়ে বলল, "রিহিকে! তুমি কি আমার বিরুদ্ধে নালিশ করবে?"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "না। আমি করব না।"

"তাহলে সমস্যা কী?"

"আমাকে বললে কোনো সমস্যা নাই। কিন্তু এরকম আজগুবি কথা বলার দরকার কী?"

টিশা কোনো কথা বলল না, ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। আমি বললাম, "তাকিয়ে দেখো, আমাদের পুরো শহরটাকে প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রেখেছে। কংক্রিটের টুকরো ফেলে ফেলে প্রাচীরটা তৈরি করেছে। কত উঁচু প্রাচীর দেখেছ?"

টিশা নিচে তাকাল, তারপর বলল, "দেখেছি।"

"বাইরে যদি বিপদ না থাকবে তাহলে প্রাচীর দিয়ে শহরটাকে ঘিরে রাখবে কেন?"

টিশা বলল, "আমি তো কেনো বিপদ দেখি না।"

আমি বড়মানুষের মতো ভঙ্গি করে বললাম, "তুমি দেখ না মানে এই নয় যে বিপদ নেই। আছে, নিশ্চয়ই আছে।"

টিশা হঠাৎ করে ঘুরে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাদের শহরের মাঝে বিপদ নেই?"

"শহরের মাঝে?"

"হ্যাঁ, শহরের মাঝে? এই বিশাল প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রাখা শহরের মাঝে কোনো বিপদ নেই?"

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, "কিসের বিপদ? আমরা তো শহরে বেশ নিরাপদেই আছি।"

টিশা মুখ শক্ত করে বলল, "কুনিলের কথা মনে আছে? কুনিল কত হাসিখুশি ছেলে ছিল মনে আছে?"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "মনে আছে।"

"আর এখন? কুনিলকে ডিটিউন করে দিয়েছে। সকাল থেকে রাত রোদবৃষ্টিতে রাস্তা পরিষ্কার করে। আমরা যখন পাশ দিয়ে হাঁটি আমাদের দিকে তাকায় না। যখন আমাদের দিকে তাকায় আমাদের চেনে না।" হঠাৎ করে টিশার গলাটা ভেঙে গেল, "কী দোষ ছিল কুনিলের?"

আমি বললাম, "আমি জানি না। নিশ্চয়ই কিছু একটা করেছিল কুনিল। শুধু শুধু তো একজনকে ডিটিউন করে না।"

টিশা মুখ শক্ত করে বলল, "আমি বলব কুনিল কী করেছিল?"

"কী করেছিল?"

"প্রশ্ন করেছিল। কুনিল প্রশ্ন করেছিল।"

"কী প্রশ্ন করেছিল?"

"কী প্রশ্ন করেছিল সেটা মোটেও গুরুত্বপূর্ণ নয়–কুনিল প্রশ্ন করেছিল সেটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। এই শহরে কেউ কোনো প্রশ্ন করতে পারবে না। প্রশ্ন করলেই ডিটিউন করে দেওয়া হবে।"

আমি টিশার দিকে একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলাম, একটু পরে বললাম, "কুনিল তো তার প্রশ্নের উত্তর পেয়েই যেত। আর এক বছর পরেই তো ওর মাথায় ক্রেনিয়াল লাগানো হতো।"

টিশা আবার শব্দ করে হাসতে থাকে, আমি অবাক হয়ে লক্ষ করলাম তার হাসিতে কোনো আনন্দ নেই। টিশা যেভাবে হঠাৎ হাসতে শুরু করেছিল ঠিক সেভাবে হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলল, "তুমি সত্যিই বিশ্বাস কর মাথায় ক্রেনিয়াল লাগালে আমরা সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাব?"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কেন পাব না?"

"যাদের মাথায় ক্রেনিয়াল লাগিয়েছে তারা সবকিছু জানে?"

"একশবার জানে। মনে আছে মাহার কথা? মাহা কি জেনারেটরের কিছু জানত? জানত না। এখন শহরের সব জেনারেটর মাহা দেখে-শুনে রাখে। নষ্ট হবার আগে ঠিক করে ফেলে।"

টিশা আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "মাহার মাথায় ক্রেনিয়াল লাগানোর আগে সে কী করত তোমার মনে আছে?"

আমি আলাদা করে মনে করতে পারলাম না, বললাম, "কী করত?"

"গান গাইত। দিনরাত গুনগুন করে গান গাইত।"

গান গাওয়ার সাথে ক্রেনিয়ালের কী সম্পর্ক আমি বুঝতে পারলাম না, জিজ্ঞেস করলাম, "গান গাইলে কী হয়?"

"এখন মাহা গান গায় না। মুখ শক্ত করে জেনারেটর ঠিক করে। জেনারেটর ছাড়া মাহা আর কিছু জানে না।"

"তাতে কী হয়েছে?"

টিশা একটু অধৈর্য গলায় বলল, "ক্রেনিয়াল লাগানোর আগে মাহা ছিল মানুষ। এখন মাহা একটা রোবট।"

টিশার কথা শুনে আমি এবারে শব্দ করে হেসে উঠলাম। বললাম, "টিশা, তুমি এবারে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছ। মাহা মোটেও রোবট না। মাহা খুবই হাসিখুশি মানুষ।"

টিশা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। একটু বেশিই হাসিখুশি।"

"মানে?"

"একজন সত্যিকার মানুষের মাঝে মাঝে মন খারাপ হয়। মাথায় ক্রেনিয়াল লাগালে তার কোনো দিন মন খারাপ হয় না।"

"সেটা দোষের কিছু?"

"বিচুরিয়াস নামে একটা নেশা করার ড্রাগ আছে। সেটা খেলে খুবই আনন্দ হয়। তুমি বাকি জীবন প্রত্যেকদিন একটু করে বিচুরিয়াস খাবে? এই একটুখানি?"

"কেন? ড্রাগ কেন খাব?"

"তাহলে তোমার প্রত্যেকদিন খুব আনন্দ হবে।"

টিশা কী বলতে চাইছে হঠাৎ করে আমি বুঝতে পারলাম, বললাম, "তোমার ধারণা মাথায় ক্রেনিয়াল লাগানো আর ড্রাগ খাওয়া এক জিনিস?"

"যদি ক্রেনিয়াল লাগিয়ে একটা মানুষের স্বভাবটাই বদলে দেয় তাহলে আমার কাছে একই জিনিস।"

"কিন্তু কিন্তু–" আমি কেন জানি বাক্যটা শেষ করতে পারলাম না। যে কথাটি বলতে চাইছিলাম হঠাৎ করে মনে হলো সেই কথাটা অর্থহীন কথা, গুরুত্বহীন কথা।

টিশা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "কিন্তু কী? বলো?"

আমি অনিশ্চিতের মতো বললাম, "যদি মাথায় ক্রেনিয়াল লাগিয়ে একটা মানুষকে হাসিখুশি মানুষে তৈরি করা যায়, ভালো মানুষে তৈরি করা যায়, তাকে যদি নতুন কিছু শেখানো যায় তাতে দোষের কী আছে?"

টিশা আঙুল দিয়ে তার মাথাটা দেখিয়ে বলল, "আমার এই মাথায় একশ বিলিয়ন নিউরন আছে। এই একশ বিলিয়ন নিউরন আমি আমার মতো করে কন্ট্রোল করতে চাই। কোনো যন্ত্র দিয়ে সেটা কন্ট্রোল করতে চাই না।"

মাথার ভেতরে একশ বিলিয়ন নিউরন আছে সেটা আমরা কেউ জানি না। টিশা জানে, কেমন করে জানে?

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। টিশার দিকে তাকিয়ে আমি বুকের ভেতর কেমন জানি ভয়ের একটা কাঁপুনি অনুভব করি। কী বলছে এসব টিশা?

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, "আগে মানুষ স্কুলে যেত, কলেজে যেত, ইউনিভার্সিটিতে যেত, নতুন কিছু শিখত। যেটা জানত না সেটা গবেষণা করে জেনে নিত। কিন্তু এখন তো সেই নিয়ম আর নেই। এখন তো কেউ কিছু শেখে না। যখন বয়স ষোলো হয় তখন তার মাথায় ক্রেনিয়াল লাগিয়ে যেটা দরকার সেটা শিখিয়ে দেয়।"

টিশা বলল, "আমি জানি।"

"তাহলে? তাহলে তুমি যদি মাথায় ক্রেনিয়াল না লাগাও তুমি কিছু জানবে না। কিছু শিখবে না। অশিক্ষিত হয়ে থাকবে। মূর্খ হয়ে থাকবে।"

টিশা মাথা নাড়ল, বলল, "আমি অশিক্ষিত মূর্খ না। ভিডি টিউবে বই পড়ে আমি অনেক কিছু শিখেছি।"

আমি বললাম, "কিন্তু সত্যিকারের কিছু শেখনি। সত্যিকারের কিছু শিখতে হলে মাথায় ক্রেনিয়াল লাগাতে হয়।"

টিশা বলল, " সেটা সবাই বলে কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না।"

"তাহলে তুমি কী বিশ্বাস কর?"

টিশা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি বিশ্বাস করি মাথায় ক্রেনিয়াল না লাগিয়ে শুধু বই পড়ে সবকিছু শেখা সম্ভব। তা ছাড়া আমার মনে হয়, কী হয় অশিক্ষিত আর মূর্খ হয়ে একটা জীবন কাটিয়ে দিলে? কেন একটা যন্ত্রের হাতের পুতুল হয়ে বেঁচে থাকতে হবে?"

আমি টিশার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম, বললাম, "তুমি এসব কী বলছ টিশা!"

টিশা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি তো অন্য কাউকে বলছি না রিহি! তোমাকে বলছি। তোমাকেও কি আমার মনের কথাগুলো বলতে পারব না?"

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, "না না টিশা, কেন বলতে পারবে না। অবশ্যই বলতে পারবে। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"কিন্তু এই কথাগুলো কেমন করে তোমার মাথায় এল? এগুলো তো খুব ভয়ের কথা।"

"কথাগুলো যদি আমার মাথার ভেতরে থাকে তাহলে কেউ জানবে না। যদি তুমি বলে না দাও! আমি জানি তুমি কখনো বলবে না—তাই কেউ জানতে পারবে না যে আমার মাথার মাঝে ভয়ের কথা ঘুর ঘুর করতে থাকে। যে আমার মাথার মাঝে কী কথা ঘুর ঘুর করে তাতে কিছু আসে যায় না রিহি! কিছু আসে যায় না।"

আমি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, "একটা জিনিস জান টিশা?"

"কী?"

"একজন মানুষের মনের মাঝে কী কথা আছে সেটা কীভাবে কীভাবে জানি বের হয়ে যায়। তাই আমার খুব ভয় করে। তোমার

মনের কথা যদি কমিউনের মানুষেরা টের পেয়ে যায় তাহলে তোমার খুব বিপদ হয়ে যাবে।"

টিশা হঠাৎ খিলখিল করে হাসতে শুরু করে, তার সেই বিচিত্র হাসি যেটা শুনে আমার মনে হয় এই টিশাকে আমি চিনি না, তাকে আগে কখনো দেখিনি।

আমি বললাম, "তুমি হাসছ কেন?"

"এমনি। আমি তো বোকা একটা মেয়ে তাই মাঝে মাঝে হঠাৎ বোকার মতো হেসে ফেলি।"

আমি বললাম, "টিশা তুমি মোটেও বোকা একটা মেয়ে না। তাই আমার খুব ভয় হয়। তুমি বোকা হলে তোমাকে নিয়ে আমি একটুও ভয় পেতাম না।"

টিশা তার হাসি থামিয়ে দূরে তাকাল, সূর্যটা নিচে নেমে আসছে। আকাশে লালচে ধুলো, তার ভেতর দিয়ে সূর্যটাকে কেমন জানি বিবর্ণ দেখাচ্ছে। টিশা কিছুক্ষণ সূর্যের দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, "চলো যাই।"

বলে সে আমার জন্য অপেক্ষা না করে একটা কংক্রিটের টুকরো থেকে আরেকটা কংক্রিটের টুকরোর উপর লাফিয়ে ছুটতে শুরু করে। আমি বললাম, "দাঁড়াও টিশা! এত জোরে ছুটে যেয়ো না, আমি তোমার মতো এখানে এত জোরে ছুটতে পারি না।"

টিশা আমার কথা শুনল না, লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটতেই লাগল। আমি আর কী করব, আমিও তার পিছু পিছু ছুটতে লাগলাম। টিশার কাছাকাছি পৌঁছে বললাম, "টিশা! তোমাকে একটা কথা বলি?"

"কী কথা?"

"এই যে তুমি আমাকে এত সব কথা বলেছ সেগুলো মাথা থেকে বের করে দিতে পারবে?"

টিশা মাথা ঘুরিয়ে সূর্যটার দিকে তাকিয়ে বলল, "ঐ সূর্যটাকে তোমার কী মনে হয়?"

সে আমার কথাটা না শোনার ভান করছে। আমি আবার বললাম, "টিশা! আমার কথা একটু শোনো। তোমার মাথার ভেতর থেকে ঐ চিন্তাগুলো দূর করে দাও।"

টিশা বলল, "ঐ সূর্যটাকে দেখলে মনে হয় ওটা সুস্থ নয়, ওটার পচন ধরেছে।"

আমি বললাম, "তুমি আমার কথা না শোনার ভান করছ কেন টিশা?"

টিশা বলল, "এই কংক্রিটের টুকরোগুলো কী কুৎসিত, তাই না রিহি? সুন্দর একটা প্রাচীর তৈরি না করে এক গাদা কংক্রিটের টুকরো ফেলে দিয়ে একটা প্রাচীর কেন তৈরি করল?"

আমি বুঝলাম টিশা আমার কথার উত্তর দেবে না, তাই আমি চুপ করে গেলাম।

সূর্যটা ডুবে যাবার পর আমি আর টিশা প্রাচীর থেকে নেমে আসি। ভাঙা ধসে যাওয়া দালান, ইট পাথর কংক্রিটের জঞ্জাল, জং ধরা ভাঙা যন্ত্রপাতি পার হয়ে আমরা শহরের ভেতর ঢুকি। শহরের পথে মাঝে মাঝে টিম টিম করে আলো জ্বলছে, আধো আলো আধো অন্ধকারে মানুষজন নিঃশব্দে হেঁটে যাচ্ছে। জনমানবহীন উঁচু দালানের কোথাও কোথাও আলো জ্বলছে। দূরে ঘর ঘর শব্দ করে একটা জেনারেটর চলছে। এই শব্দটুকু না থাকলে পুরো শহরটাকে একটা ভুতুড়ে শহর বলে মনে হতো। কী মন খারাপ করা একটা পরিবেশ, আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

ঠিক তখন আমরা পথের পাশে একটা মানুষের মূর্তিকে দেখতে পেলাম। হাতে একটা মপ নিয়ে সে রাস্তা পরিষ্কার করছে, তার মাঝে কোনো ব্যস্ততা নেই। মাটির দিকে তাকিয়ে সে মপ দিয়ে ঘষে ঘষে সব আবর্জনা দূর করছে। আমরা দেখলাম মানুষটার পাশে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে তাকে কিছু একটা বলছে। আরেকটু কাছে যাবার পর আমরা মহিলার কথা শুনতে পেলাম, নিচু স্বরে বলছে, "বাবা কুনিল, একবার আমার দিকে তাকা। একবার আমার কথা শোন।"

আবছা অন্ধকারে আমরা এতক্ষণ চেহারা দেখতে পাইনি। এবারে তাকে চিনতে পারলাম, মানুষটি কুনিল। কুনিলের পাশে তার মা তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করছে। একজন মানুষকে ডিটিউন করে ফেললে তার মস্তিষ্ককে মোটামুটিভাবে অচল করে দেওয়া হয়। তখন সে কাউকে চিনতে পারে না, নিজের মাকেও চিনতে পারে না।

কুনিলের মা কাতর গলায় বলল, "বাবা কুনিল। কুনিল সোনা আমার।"

কুনিল খুব ধীরে ধীরে তার মাথা ঘুরিয়ে তার মায়ের দিকে তাকাল, আবছা অন্ধকারে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু জানি কুনিলের শূন্য দৃষ্টিতে জীবনের কোনো চিহ্ন নেই।

কুনিলের মা বলল, "বাবা কুনিল। কুনিল। কুনিল সোনা। একবার একটা কথা বল। মাত্র একবার!"

আমরা পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় শুনতে পেলাম কুনিল মুখ দিয়ে অস্পষ্ট এক ধরনের শব্দ করছে। সেই শব্দের কোনো অর্থ নেই। একটি অবোধ পশু আর কুনিলের মাঝে এখন কোনো পার্থক্য নেই। কুনিলের মা সেটা এখনো মেনে নিতে পারেনি।

২.

লম্বা হলঘরটাতে আমরা সারি বেঁধে বসে আছি। আজকে এই শহরের কমিউনের সভা, তাই শহরের মানুষেরা এসেছে। শহরের সব মানুষকে নিয়ে একসাথে সভা করা যায় না। তাই একেক দিন একেক ধরনের মানুষকে নিয়ে সভা করা হয়। আজকের সভাটা আমাদের মতো কমবয়সী ছেলেমেয়েদের নিয়ে। সবাই এসেছে কিনা বুঝতে পারছি না—আমি এদিক সেদিক তাকিয়ে পরিচিত সবাইকে পেয়ে গেছি। শুধু টিশাকে এখনো দেখছি না। আমি পাশের জায়গাটা খালি রেখেছি টিশার জন্যে—টিশা এতই খেয়ালি মেয়ে সে হয়তো আমার পাশে বসতেই চাইবে না।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে বসে ছিলাম, হঠাৎ দেখলাম সবাই এক ধরনের আনন্দের শব্দ করে উঠে দাঁড়িয়েছে, আমিও তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম। হলঘরের সামনে উঁচু স্টেজে আমাদের শহরের কমান্ড্যান্ট এসে হাজির হয়েছে, তার সাথে কুশ, মিকি আর ক্রিটন। আমরা আনন্দে হাততালি দিতে থাকি। কুশ, মিকি আর ক্রিটনের বয়স ষোলো হয়ে গেছে, তাই তাদের মাথায় ক্রেনিয়াল লাগানোর জন্য নিয়ে গিয়েছিল। অনেকদিন তাদের দেখিনি। আজকে কমান্ড্যান্ট তাদেরকে নিয়ে এসেছে। তাদের সাথে লুক আর হুনাও ছিল, এই দুজনকে দেখতে পাচ্ছি না, আমি তাদের দেখার জন্য মাথা উঁচু করে আশেপাশে তাকাতে লাগলাম কিন্তু খুঁজে পেলাম না।

"নেই। আর কেউ নেই।" কানের কাছে কেউ একজন ফিসফিস করে কথা বলছে, আমি মাথা ঘুরে তাকালাম, কখন টিশা এসে দাঁড়িয়েছে আমি লক্ষ করিনি।

আমি টিশার দিকে তাকালাম, টিশা নিচু গলায় বলল, "লুক আর হুনা নেই।"

"কোথায়? ওরা কোথায়?"

টিশা তার ঠোঁটে আঙুল রেখে বলল, "শ-স-স-স, প্রশ্ন করা নিষেধ।"

আমরা কমান্ড্যান্টের গমগমে গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম, "আমার প্রিয় সন্তানেরা। কমিউনের সভায় তোমাদের আমন্ত্রণ!"

কমান্ড্যান্ট একটু থামল, আমরা জোরে জোরে হাততালি দিলাম। কমান্ড্যান্ট যখন কথা বলে তখন মাঝে মাঝে হাততালি দিতে হয়।

কমান্ড্যান্ট বলল, "আজ আমাদের খুব আনন্দের দিন! আজ কুশ, মিকি আর ক্রিটন তোমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। অল্প কিছুদিন আগেও এই তিনজন ছিল অন্য দশজনের মতো কমবয়সী সাধারণ ছেলে আর মেয়ে। এখন তারা এই শহরের মূল্যবান নাগরিক। দায়িত্বশীল নাগরিক। তাদের মাথায় এখন ক্রেনিয়াল লাগানো হয়েছে, মানুষের সঞ্চিত জ্ঞান ভান্ডারের সাথে যোগাযোগ করে যখন খুশি তারা যে কোনো জ্ঞান জেনে নিতে পারবে।"

কমান্ড্যান্ট আবার থামল, যার অর্থ আবার আমাদের চিৎকার করে আনন্দ প্রকাশ করতে হবে, হাততালি দিতে হবে। আমরা চিৎকার করলাম, হাততালি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করলাম। আমি পাশে তাকিয়ে দেখলাম টিশা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। আমি গলা নামিয়ে তাকে বললাম, "টিশা! হাততালি না দিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন?"

টিশা কিছু না বলে একদৃষ্টে সামনে তাকিয়ে রইল। কমান্ড্যান্ট আবার কথা বলতে শুরু করল, "তোমরা সবাই জান আজ থেকে একশ বছর আগে পৃথিবীর সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এটি মনে হয়, সভ্যতার নিয়ম, একেবারে উঁচুতে উঠে সেটা ধ্বংস হয়ে যায়। প্রাচীনকালে সভ্যতা ছিল বিচ্ছিন্ন, তাই তারা বিচ্ছিন্নভাবে ধ্বংস হতো। এক প্রান্তে সভ্যতা ধ্বংস হওয়ার পর অন্য প্রান্তে সভ্যতা গড়ে উঠত। কিন্তু একশ বছর আগে যখন পৃথিবীর সভ্যতা ধ্বংস হয়েছিল সেটি ছিল একটি পরিপূর্ণ ধ্বংসলীলা। তোমরা কি কেউ বলতে পারবে, কেন এটি ছিল একটি পরিপূর্ণ ধ্বংস প্রক্রিয়া?"

আমরা কেউ কিছু জানি না, আমাদের জানার কোনো উপায় নেই। নিজেরা নিজেরা মাঝে মাঝে কথা বলি, তার মাঝে কোনো তথ্য থাকে না, নানারকম গুজব থাকে। তাই আমরা কমান্ড্যান্টের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলাম না। তারপরও দেখলাম সামনের দিকে বসে থাকা লাল চুলের একজন কমবয়সী মেয়ে উত্তর দেবার চেষ্টা করল, বলল, "কারণ শেষ যুদ্ধে এক দেশ আরেক দেশের বিরুদ্ধে নিউক্লিয়ার বোমা ব্যবহার করেছিল।"

কমান্ড্যান্টের মুখে এক ধরনের হাসি ফুটে ওঠে, সে হাততালি দিয়ে বলল, "চমৎকার! তোমার উত্তরটি পুরোপুরি ঠিক নয়, কিন্তু তারপরও তোমাকে অভিনন্দন। তোমার মাথায় কোনো ক্রেনিয়াল নেই, তারপরও তুমি নিউক্লিয়ার বোমার কথা জান! তোমাকে অভিনন্দন।"

লাল চুলের মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, "তাহলে কেন সারা পৃথিবীর সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেল?"

কমান্ড্যান্ট গম্ভীর মুখে বলল, "কারণটি মানুষের নির্বুদ্ধিতা।" কথাটি শেষ করে কমান্ড্যান্ট থেমে গেল, কাজেই আমরা সবাই বিস্ময়ের মতো শব্দ করলাম, জিজ্ঞেস করলাম, "নির্বুদ্ধিতা?"

কমান্ড্যান্ট মুখটি আরো গম্ভীর করে বলল," হ্যাঁ নির্বুদ্ধিতা। তোমরা কি সেই নির্বুদ্ধিতার ইতিহাস শুনতে চাও?"

আমরা চিৎকার করে বললাম, "শুনতে চাই, শুনতে চাই।" শুধু টিশা কোনো কথা না বলে সামনে তাকিয়ে থেকে বিড় বিড় করে বলল, "কিন্তু লুক আর হুনা কোথায় গেল?" তার কথাটা আমি ছাড়া আর কেউ শুনতে পেল না।

কমান্ড্যান্ট তখন এই পৃথিবীতে মানবসভ্যতা ধ্বংসের ইতিহাস বলতে শুরু করল। কমান্ড্যান্টের গলার স্বর গমগমে, কথা বলার ধরনটিও ভালো, আমরা সবাই আগ্রহ নিয়ে শুনতে থাকি। তার কথার সারমর্মটি এরকম:

পৃথিবীতে সভ্যতার একটা বিস্ফোরণ শুরু হয়েছিল প্রায় সাড়ে তিনশ বছর আগে। মোটামুটিভাবে বলা যায় এই নতুন সভ্যতার পেছনে ছিল একটা যন্ত্র, ভুল করে তার নাম দেওয়া হয়েছিল কম্পিউটার–অর্থাৎ যেটা দিয়ে হিসাব করা হয়। দেখা গেল এই যন্ত্রটি

আসলে অন্যরকম। এর আগে যতবার কোনো যন্ত্র তৈরি করা হয়েছে, সেটি সব সময়ে একটা নির্দিষ্ট কাজ করেছে–কিন্তু কম্পিউটার নামক যন্ত্রটা কোনো নির্দিষ্ট কাজের জন্য তৈরি হয়নি, এটা যে কোনো কাজে ব্যবহার করা যেত। যন্ত্রটার আকার ধীরে ধীরে ছোট হতে শুরু করল এবং এক সময় সেটা সম্ভাব্য অসম্ভাব্য সব জায়গায় ব্যবহার হতে শুরু করল।

এর আগে তথ্য জমা করে রাখা কিংবা তথ্য ব্যবহার করার ব্যাপারটা ছিল কঠিন, তাই তথ্যটুকু নির্দিষ্ট ছিল অল্প কিছু ক্ষমতাশালী মানুষের জন্য। কিন্তু ধীরে ধীরে নেটওয়ার্কিং এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেল যে, যে কোনো মানুষই তথ্য পেতে শুরু করল। তখন মানুষের মাঝে ধীরে ধীরে একটা খুব বড় পরিবর্তন ঘটে গেল। এর আগে মানুষ তথ্য জমা রাখত তার মস্তিষ্কে, সেটা প্রক্রিয়া করত তার মস্তিষ্কে। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে দেখা গেল মানুষ তথ্য রাখা কিংবা প্রক্রিয়া করার জন্য মস্তিষ্ক ব্যবহার করে না। সবকিছুই মানুষ করে যন্ত্র দিয়ে, কম্পিউটার নামের সেই যন্ত্রটি তখন আর যন্ত্র নেই, তার বুদ্ধিমত্তা আছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান-গবেষণা তখন মানুষ নিজেরা করে না, বুদ্ধিমান কোয়ান্টাম কম্পিউটার দিয়ে করে। একজন মানুষ কতটুকু ক্ষমতাশালী সেটা নির্ভর করে তার কোয়ান্টাম কম্পিউটারে কতটুকু অধিকার তার উপর। আগে সোনা রুপা হীরা ছিল মূল্যবান সম্পদ, তখন সম্পদ হয়ে গেল কোয়ান্টাম কম্পিউটারের ক্ষমতা।

মানুষে মানুষে এক ধরনের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। ইতিহাসে সব সময়েই দেখা গেছে একদল মানুষ চেষ্টা করেছে অন্য দলের মানুষকে দমন করে রাখতে–এখানেও সেটা শুরু হয়ে গেল। প্রথমে যুদ্ধ শুরু হলো এক দেশের কোয়ান্টাম কম্পিউটার দিয়ে অন্য দেশের কোয়ান্টাম কম্পিউটার দখল করে নেওয়ার জন্য। সেটা করার জন্য কাউকে এক দেশ থেকে অন্য দেশে আক্রমণ করতে হয় না—নেটওয়ার্কের ভেতর দিয়ে এক দেশের কোয়ান্টাম কম্পিউটার অন্য দেশে আক্রমণ করতে শুরু করে।

তথ্যের জন্য মানুষ নিজের মস্তিষ্কের উপর নির্ভর না করে তখন নেটওয়ার্ক আর কোয়ান্টাম কম্পিউটারের উপর নির্ভর করতে শুরু করে। সেটি ছিল মানুষের প্রথম নির্বুদ্ধিতা। এক দেশের পক্ষ থেকে

অন্য দেশের উপর আক্রমণ করার জন্য মানুষ যখন নিজেদের পরিকল্পনার উপর নির্ভর না করে কোয়ান্টাম কম্পিউটারের উপর নির্ভর করতে শুরু করে সেটি ছিল দ্বিতীয় নির্বুদ্ধিতা।

মানুষকে এই নির্বুদ্ধিতার জন্য চরম মূল্য দিতে হয়েছে, কোয়ান্টাম কম্পিউটার প্রথমে একে অন্যকে ধ্বংস করেছে। মানুষ তাদের দৈনন্দিন কাজ, শিক্ষা, গবেষণা, চিকিৎসা, খাবার, আশ্রয় সবকিছুর জন্য এই কম্পিউটার আর নেটওয়ার্কের উপর নির্ভর করত। হঠাৎ করে তাদের সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেল। মানুষ রোগে শোকে অনাহারে বিনা চিকিৎসায় মারা যেতে লাগল। পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা কমতে কমতে অর্ধেক থেকেও নিচে নেমে এল, তখন সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপারটি ঘটতে শুরু করে। কোয়ান্টাম কম্পিউটার নিজে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে একে অন্যের উপর নিউক্লিয়ার বোমা ছুড়তে শুরু করে। দেখতে দেখতে পুরো পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যায়। বিচ্ছিন্নভাবে এখানে-সেখানে কিছু মানুষ বেঁচে থাকে—সারা পৃথিবীতে এখন কতজন মানুষ আছে সেটিও কেউ জানে না। কয়েক হাজার নাকি কয়েক লক্ষ, নাকি কয়েক কোটি সে কথা কেউ বলতে পারে না।

কমান্ড্যান্ট যখন তার কথা শেষ করল তখন আমরা সবাই নিঃশব্দে বসে রইলাম। ঠিক কী কারণ জানা নেই আমাদের কেমন যেন এক ধরনের আতঙ্ক হতে থাকে। সামনের দিকে বসে থাকা কমবয়সী একটা ছেলে জিজ্ঞেস করল, "এখন কী হবে?"

কমান্ড্যান্টের মুখটা এতক্ষণ কেমন জানি থমথমে হয়ে ছিল। এই প্রথমবার সেখানে আমরা একটু হাসির চিহ্ন দেখতে পেলাম। কমান্ড্যান্ট হাসি হাসি মুখ করে বলল, "আমি খুব আনন্দের সাথে তোমাদেরকে বলতে চাই, প্রায় কয়েক বৎসরের ভয়াবহ ধ্বংসলীলার পর আমরা প্রথমবার আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে যাচ্ছি।"

কমবয়সী ছেলেটা জিজ্ঞেস করল, "কীভাবে?"

কমান্ড্যান্ট বলল, "মানুষ যে নির্বুদ্ধিতা করেছিল আমরা সেই নির্বুদ্ধিতা থেকে সরে এসেছি। মানুষ তার মস্তিষ্ক ব্যবহার না করে সকল সিদ্ধান্ত নিত কম্পিউটার নামক যন্ত্র দিয়ে, নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে। আমরা মানুষের মস্তিষ্ক আবার ব্যবহার করতে শুরু করেছি, তোমরা নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছ তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে

কুশ, মিকি আর ক্রিটন। তাদের মাথায় ক্রেনিয়াল লাগানো হয়েছে, সেই ক্রেনিয়াল ব্যবহার করে আমরা সেখানে বিশাল তথ্যের সম্ভার ঢুকিয়ে দিয়েছি। তারা ইচ্ছে করলে সেই তথ্য ব্যবহার করে যে কোনো কাজ করতে পারবে।"

কমান্ড্যান্ট চোখ নাচিয়ে বলল, "আমার কথা বিশ্বাস না করলে তোমরা নিজেরা প্রশ্ন করে যাচাই করে নিতে পার।"

কেউ প্রশ্ন করল না। কোনো কিছু নিয়ে প্রশ্ন করতে হলে সেটা সম্পর্কে কিছু জানতে হয়। আমরা কিছুই জানি না, কী নিয়ে প্রশ্ন করব?

কমান্ড্যান্ট আবার বলল, "করো। প্রশ্ন করো।"

খুব ইতস্তত করে মাঝামাঝি জায়গা থেকে একজন প্রশ্ন করল, "চিমটি দিলে ব্যথা লাগে কেন?"

প্রশ্নটি শুনে অনেকেই হেসে উঠল, কুশ, মিকি আর ক্রিটন হাসল না। মিকি গম্ভীর হয়ে বলল, "আমাদের সারা শরীরে স্নায়ুর একটা বিশাল নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে আছে। এই পুরো নেটওয়ার্ক কেন্দ্রীভূত হয়েছে আমাদের মস্তিষ্কে। আমাদের মস্তিষ্কে দশ হাজার কোটি নিউরন। এক নিউরন অন্য নিউরনের সাথে..."

মিকি যন্ত্রের মতো কঠিন কঠিন বৈজ্ঞানিক কথা বলতে থাকল। নানারকম সংখ্যা, নানারকম জটিল জটিল নাম, নানারকম সূত্র, নানারকম গবেষণার ইতিহাস—যার বেশির ভাগ আমরা বুঝতেই পারলাম না। অল্প কিছুদিন আগেই মিকি ছিল আমাদের মতো খুবই সাধারণ একটা ছেলে, এখন সে রীতিমতো একজন জ্ঞানী মানুষ। কী আশ্চর্য!

মিকি শেষ পর্যন্ত যখন কথা শেষ করল তখন আমরা সবাই প্রথমে চুপচাপ বসে রইলাম। আমাদের বেশির ভাগ মানুষ ততক্ষণে ঠিক কোন প্রশ্নের উত্তরে মিকি এত বড় একটা ব্যাখ্যা দিয়েছে সেটাই ভুলে গেছি। কমান্ড্যান্ট তখন হাসি হাসি মুখে সবার দিকে তাকাল এবং তখন আমরা বুঝতে পারলাম আবার আমাদের হাততালি দিতে হবে। আমরা তখন আবার জোরে জোরে হাততালি দিলাম।

হাততালি শেষ হবার পর কমান্ড্যান্ট আমাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আর কোনো প্রশ্ন?" তার কথার ভঙ্গি দেখেই বুঝতে

পারলাম কমান্ড্যান্ট চাইছে আরো কেউ একটা প্রশ্ন করুক। কিন্তু প্রশ্ন করার কাউকে খুঁজে পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত পেছন থেকে একজন ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, "একটা ঘরে গেলে ঘরের আলো কেমন করে জ্বলে ওঠে?"

মিকি বলল, "আমার মস্তিষ্কের তথ্য শুধু জীববিজ্ঞানের তথ্য। অন্য কাউকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।" উত্তরের জন্যে মিকি কুশ আর ক্রিটনের দিকে তাকাল।

ক্রিটন মাথা নেড়ে বলল, "আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু তৈরি হয়েছে কিছু মৌলিক কণা দিয়ে। এই মৌলিক কণাকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক ভাগের নাম লেপটন, আমাদের সবচেয়ে পরিচিত লেপটন হচ্ছে ইলেকট্রন..."

ক্রিটন ঠিক মিকির কথামতোই কঠিন কঠিন বৈজ্ঞানিক শব্দ ব্যবহার করে খুব জটিল কথা বলতে শুরু করল। মিকির কথা তবু আমরা একটু বুঝেছিলাম, ক্রিটনের কথা আমরা কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমরা সবাই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে থাকলাম, যখন ক্রিটন শেষ পর্যন্ত থামল আমরা নিজেরাই জোরে জোরে হাততালি দিতে শুরু করলাম।

আমরা ভেবেছিলাম কমান্ড্যান্ট আবার আমাদেরকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে বলবে কিন্তু মনে হয় সে টের পেয়েছে আমরা মিকি আর ক্রিটনের কোনো কথাই বুঝতে পারিনি, তাই সে আর চেষ্টা করল না। খানিকক্ষণ আমাদের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "এখন তোমরা বুঝতে পেরেছ কীভাবে আমরা আবার একেবারে শূন্য থেকে একটা সভ্যতা তৈরি করতে শুরু করেছি?"

সত্যি কথা বলতে কি আমি ঠিক বুঝতে পারিনি কীভাবে কয়েকজন ছেলেমেয়ের মাথায় ক্রেনিয়াল লাগিয়ে তাদেরকে কঠিন কঠিন জ্ঞানের বিষয় শিখিয়ে দিলেই একটা সভ্যতা তৈরি হয়ে যায়। সভ্যতা জিনিসটা কী আমি সেটাও জানি না!

আমার মতো আরো অনেকেরই মনে হয় এরকম প্রশ্ন ছিল, একজন সাহস করে জিজ্ঞেস করে ফেলল, "সভ্যতা তৈরি করতে কী কী লাগে?"

কমান্ড্যান্ট হাল ছেড়ে দেবার মতো করে মাথা নাড়ল, বলল, "তোমাকে এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না। আগের সভ্যতার মূল উপাদানটি ছিল কম্পিউটার নামের একটি যন্ত্র—"

"আমাদের কি কম্পিউটার আছে?"

কমান্ড্যান্ট কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "তোমরা শুনে খুব খুশি হবে পৃথিবীর মানুষ আবার নতুন করে কম্পিউটার তৈরি করতে শুরু করেছে। তবে এখন এটাকে কম্পিউটার বলে না। এখন এটার নাম ক্রেনিপিউটার।"

এই প্রথমবার আমরা সবাই সত্যিকারভাবে চমকে উঠে কমান্ড্যান্টের কথা শুনতে আগ্রহী হলাম। প্রায় সবাই একসাথে জিজ্ঞেস করতে শুরু করল, "কোথায়? দেখতে কেমন? কত বড়? কী করতে পারে?"

কমান্ড্যান্ট হাত নেড়ে সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "অনেকদিন থেকে ক্রেনিপিউটার তৈরি করার জন্য কাজ চলছিল। পৃথিবীর সব ফ্যাক্টরি ধ্বংস হয়ে গেছে বলে কাজটি খুব কঠিন। নানা জায়গা থেকে টুকরো টুকরো যন্ত্রপাতি জোগাড় করে তৈরি করতে হচ্ছে। এখান থেকে প্রায় দুশ কিলোমিটার দূরে মানুষের আরেকটা আস্তানা আছে—জ্ঞানবিজ্ঞানে তারা আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে। সেখানে একজন বিজ্ঞানী আছে তার নাম হচ্ছে লিংলি। বিজ্ঞানী লিংলি। আসলে বলা উচিত মহাবিজ্ঞানী লিংলি। সেই মহাবিজ্ঞানী লিংলি ক্রেনিপিউটার তৈরি করছে।"

কমান্ড্যান্ট একটু থামল, আমরা ঠিক বুঝতে পারলাম না, এখন মহাবিজ্ঞানী লিংলির জন্য আমাদের চিৎকার করে আনন্দ প্রকাশ করার দরকার আছে কি না। কয়েকজন অবশ্যি আনন্দধ্বনি করেও ফেলল।

কমান্ড্যান্ট মনে হলো এবারে আনন্দধ্বনির জন্য অপেক্ষা করছে না, সে আবার কথা বলতে শুরু করল, বলল, "তোমরা শুনে খুব খুশি হবে। আমাদের এই শহর থেকে আমরা বিজ্ঞানী লিংলির সাথে যোগাযোগ করেছি এবং বিজ্ঞানী লিংলি আমাদের সব রকম সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।"

এবারে আমরা হাততালি দিয়ে আনন্দের শব্দ করলাম। কমান্ড্যান্ট বলতে থাকল, "বিজ্ঞানী লিংলি বলেছে এই দুই শহরের

মাঝে একশ বছর আগের যে নেটওয়ার্কের যোগাযোগ আছে সেটাকে আবার কার্যকর করে নতুন সভ্যতার নতুন ক্রেনিপিউটারের সাথে যোগাযোগ করে দেবে।"

আমরা আবার আনন্দের শব্দ করতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তার আগেই হঠাৎ টিশা চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, "তার জন্য আমাদের বিজ্ঞানী লিংলিকে কী দিতে হবে?"

ঠিক কী কারণ জানা নেই হঠাৎ করে পুরো হলঘরটি একেবারে কবরের মতো নীরব হয়ে গেল, মুহূর্তে পুরো পরিবেশটাও কেমন জানি থমথমে হয়ে গেল। কমান্ড্যান্ট কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে থেকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে, মেয়ে?"

টিশা কাঁপা গলায় বলল, "আমার নাম টিশা। আমার আইডি সাত সাত দুই নয়..."

টিশাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই কমান্ড্যান্ট জিজ্ঞেস করল, "তুমি কেন এই প্রশ্নটি করেছ? তোমার উদ্দেশ্য কী?"

টিশা ভয় পাওয়া গলায় বলল, "আমার কোনো উদ্দেশ্য নেই। আমি শুধু জানতে চাচ্ছিলাম—"

"তুমি কেন এমন একটা বিষয় জানতে চাইবে?"

টিশা তার গলার স্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল, কিন্তু স্বাভাবিক রাখতে পারল না, প্রায় ভাঙা গলায় বলল, "আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, আমি শুধু জানতে চাইছিলাম যে আমাদের কিছু দিতে হবে কি না। সব সময় দেখে এসেছি কিছু একটা পেতে হলে কিছু একটা দিতে হয়।"

কমান্ড্যান্টের মুখটা দেখতে দেখতে হঠাৎ করে কেমন জানি কঠিন হয়ে ওঠে। তাকে দেখতে একটা নিষ্ঠুর মানুষের মতো মনে হতে থাকে। কমান্ড্যান্ট প্রায় চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "কিছু একটা পেতে হলে কিছু একটা দিতে হয়–কী আশ্চর্য!"

কমান্ড্যান্ট আরো কিছু একটা বলতে চাচ্ছিল ঠিক তখন দরজায় দাঁড়ানো গার্ডদের ধাক্কা দিয়ে উদভ্রান্তের মতো দেখতে একজন মহিলা হলঘরে ঢুকে গেল, প্রায় ছুটে কমান্ড্যান্টের কাছে যেতে যেতে চিৎকার করে বলতে থাকে, "আমার হুনা কই? হুনা! আমার হুনা।"

আমরা সবাই হুনার মাকে চিনতে পারলাম, খুব হাসিখুশি একজন মহিলা কিন্তু এই মুহূর্তে তাকে দেখাচ্ছে প্রায় উন্মাদিনীর মতো। হুনার মা বেশি দূর যেতে পারল না তার আগেই পাহাড়ের মতো বড় দুজন গার্ড এসে দুই পাশ থেকে তাকে ধরে প্রায় টেনে হলঘরের বাইরে নিতে থাকে।

কমান্ড্যান্ট সেদিকে তাকাল না, তাকে দেখে মনে হলো সে পুরো ব্যাপারটি একটুও দেখেনি।

আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমাদের সভা আজকের মতো এখানেই শেষ।"

টিশা ফিসফিস করে বলল, "বুঝেছ রিহি?"

আমি চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম, "কী বুঝব?"

"হুনা আর লুক কোথায়?"

"কোথায়?"

"বিজ্ঞানী লিংলিকে দিয়েছে। আরো দেবে। তোমাকে আমাকেও দেবে। যারা একটু বেশি বোঝে সবাইকে দেবে।"

"কেন?"

"কিছু একটা পেতে হলে কিছু একটা দিতে হয়!" বলে টিশা আবার হাসির ভঙ্গি করল, আনন্দহীন এক ধরনের হাসি।

৩.

একটা বিশাল জেনারেটরের বড় বড় নাট এবং বল্টুগুলো আমরা সবাই মিলে খুলছিলাম। কেন খুলছি আমরা জানি না। আমাদেরকে খুলতে বলেছে তাই খুলছি। আবার যখন লাগাতে বলবে তখন লাগাব। জেনারেটরের ভেতরে কী হয়, কেমন করে কাজ করে সেগুলো জানে মাহা। মাহা আমাদের থেকে মাত্র দুই বছরের বড়, মাথার মাঝে ক্রেনিয়াল লাগানোর পর সে কয়েকদিনের মাঝে জেনারেটর ঠিক করা শিখে গেছে। সে একটা নষ্ট জেনারেটরের সামনে দাঁড়িয়ে তার মিটারগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তারপর এখানে সেখানে ঠোকা দেয়। কিছু একটা শোনে তারপর আমাদের হাতে বড় বড় রেঞ্জ দিয়ে নাটবল্টুগুলো দেখিয়ে সে আমাদেরকে বলে, "এগুলো খোলো।" আমরা সেগুলো খুলি, তখন সে জেনারেটরের ভেতর ঢুকে যায়। নানারকম তার ধরে টানাটানি করে, তারপর আমাদের বড় বড় মোটা মোটা তার ধরিয়ে দিয়ে একটা ওয়েল্ডিং মেশিন দিয়ে বলে, "ওয়েল্ড করো।" আমরা বড় বড় আর্ক জ্বালিয়ে ওয়েল্ড করি। তারপর মাহা আবার জেনারেটরের ভেতরে ঢুকে কুটুর কুটুর করে কাজ করে, তারপর কালিঝুলি মেখে বের হয়ে আমাদের নাটবল্টুগুলো দিয়ে বলে "এগুলো লাগাও।" আমরা সেগুলো লাগাই। লাগানো শেষ হলে মাহা ঘুরে ঘুরে দেখে, তারপর আমাদেরকে বলে, "দূরে সরে যাও।" আমরা দূরে সরে যাই। তখন মাহা বড় বড় সুইচ গায়ের জোরে টেনে ধরে, তখন কড়াত কড়াত শব্দ করে স্পার্ক হয়, কালো ধোঁয়া বের হয় তারপর হঠাৎ করে ঘর ঘর শব্দ করে বিশাল জেনারেটর চালু হয়ে যায়। জেনারেটর ঘরের বড় বড় আলোগুলো জ্বলে ওঠে। আমরা সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠি, শুধু মাহা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

সে হাসে না, কথা বলে না, গম্ভীর মুখে জেনারেটরের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর আমাদের দিকে না তাকিয়ে সে হেঁটে হেঁটে চলে যায়। আমরা পেছন থেকে দেখি তার মাথায় একটা গর্ত, সেই গর্তে একটা ধাতব সিলিন্ডার। এটা হচ্ছে ক্রেনিয়াল, এই ক্রেনিয়াল দিয়ে তার মাথার মাঝে জেনারেটরের সব কিছু ঢোকানো হয়েছে। আমাদের বন্ধু মাহা এখন বড় ইঞ্জিনিয়ার। সে এখন আমাদের সাথে বলার মতো কোনো কথা খুঁজে পায় না। আগে সে সারাক্ষণ গুনগুন করে গান গাইত, এখন গান তো অনেক দূরের কথা সে কখনো কথাই বলে না। আমি বুঝতে পারি না একজন ক্রেনিয়াল লাগিয়ে অনেক কিছু শিখে গেলে কেন সে আর তার পুরোনো বন্ধুদের সাথে কথা বলতে পারে না?

জেনারেটরের বড় বড় নাটবল্টুগুলো খুলতে খুলতে দুপুর হয়ে গেল। আমরা তখন কাজ বন্ধ করে বাইরে এসে দেয়ালের উপর পা ঝুলিয়ে বসে আমাদের খাবারের প্যাকেট বের করে খেতে থাকি। শুকনো রুটি, শুকনো কৃত্রিম প্রোটিনের টুকরা আর বোতলে করে ঝাঁঝালো পানীয়। বিস্বাদ খাবার, কটু পানীয় কিন্তু সেগুলোই আমরা শখ করে খাই। খাবারগুলো অনেক হিসাব করে তৈরি করা হয়, এগুলো খেলে শরীরের যা যা দরকার সব পেয়ে যায়। অসুখ হয় না, মাংসপেশি গড়ে ওঠে, হাড় শক্ত হয়। তাই আমরা সেই বিস্বাদ খাবার হইচই করে খাই, খেতে খেতে গল্প করি।

শুধু টিশা আমদের গল্পে যোগ দেয় না। সে তার ছোট ভিডি রিডার হাতে নিয়ে একটার পর একটা বই পড়ে যায়। সে কী বই পড়ে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, ভেবেছিলাম প্রাচীন রোমান্টিক কাব্য– আসলে তা নয়, সে কঠিন কঠিন বই পড়ে। মানুষের মস্তিষ্কে কী থাকে, বীজ থেকে গাছ কেমন করে জন্মায়, অণুপরমাণুর গঠন কী রকম, আকাশ থেকে বিদ্যুৎ কেমন করে হয় এই সব নিয়ে বই। তাকে দেখে মনে হয় সে বুঝি মাথায় ক্রেনিয়াল লাগানোর আগেই সবকিছু শিখে ফেলতে চায়।

টিশা কারো সাথে খুব বেশি কথা বলে না, কমিউনের সেই সভায় কমান্ড্যান্টের সাথে তার সেই কথোপকথনের পর অন্যেরাও তার সাথে কথা বলার সাহস পায় না। কে জানে কখন কে কী বিপদে পড়বে, কাকে আবার ডিটিউন করে দেবে!

দেয়ালে পা ঝুলিয়ে বসে খেতে খেতে আমি দেখতে পেলাম টিশা ধসে পড়া একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে তার ভিডি রিডারে বই পড়ছে। পাশে তার খোলা খাবারের প্যাকেট, সেখান থেকে একটা রুটির টুকরো বের করে আধখানা খেয়ে মনে হয় খেতেই ভুলে গেছে।

আমি দেয়াল থেকে লাফ দিয়ে নেমে টিশার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার পায়ের শব্দ শুনে টিশা মুখ তুলে তাকাল। যদিও সে বুঝতে দিতে চায় না তারপরেও আমি বুঝতে পারলাম আমাকে দেখে তার চোখে-মুখে একটা আনন্দের ছায়া পড়ল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী পড় টিশা?"

"সময় পরিভ্রমণের উপর একটা বই।"

"সময় পরিভ্রমণ? সেটা আবার কী?"

"এই মনে করো ভবিষ্যতে না হলে অতীতে চলে যাওয়া।"

আমি হেসে বললাম, "যাও! সেটা কি আবার সম্ভব নাকি?"

টিশা মুখ গম্ভীর করে বলল, "বিজ্ঞানীরা মনে করেন সম্ভব।"

আমি টিশার পাশে বসে বললাম, "ঠিক আছে সম্ভব হলে সম্ভব। তাতে তোমার আমার কী? তুমি কি ভবিষ্যতে যেতে পারবে? অতীতে যেতে পারবে?"

"যেতে না পারলে নাই, কিন্তু জানতে তো ক্ষতি নেই।"

"তার জন্য এত তাড়াহুড়ার কী আছে? ক্রেনিয়াল লাগালে একদিনে সব জেনে যাবে। এত কষ্ট করে ভিডি রিডারে বই পড়তে হবে কেন?"

টিশা হাসল, বলল, "বই পড়তে আমার কষ্ট হয় না। আমি দিনরাত বই পড়তে পারব।"

আমি বললাম, "তুমি পাগল।"

টিশা হাসল, বলল, "মনে হয় তুমি ঠিকই বলেছ। মনে হয় আমি আসলেই পাগল।"

টিশা নিঃশব্দে কিছুক্ষণ দূরে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, "আমার মাঝে মাঝেই মনে হয় যদি আমাদের পড়তে না শেখাত তাহলে কী হতো?"

আমি তার কথা বুঝতে পারলাম না। বললাম, "কেন? পড়তে শেখাবে না কেন?"

"হতেও তো পারত! সবাই মিলে ঠিক করত কাউকে পড়াতে শেখানোর দরকার নেই। যখন ষোলো বছর বয়স হবে তখন মাথার মাঝে ক্রেনিয়াল বসিয়ে সেখান দিয়ে পড়তে শেখাবে!"

আমি বিষয়টা এভাবে চিন্তা করিনি। টিশা ঠিকই বলেছে– আমাদেরকে ছোট থাকতে পড়তে শিখিয়েছে। না শেখালেও ক্ষতি ছিল না। পড়তে শিখে আমাদের অবশ্যি খুব বেশি লাভ হয়নি, ক্ষতিও হয়নি। টিশার অনেক লাভ হয়েছে, সে দিনরাত বই পড়তে পারে। কে জানে এটা হয়তো লাভ না, এটা হয়তো ক্ষতি। পড়তে পড়তে টিশা অন্যরকম হয়ে গেছে, এখন সে অন্যভাবে চিন্তা করে। সে জন্য টিশা কোনদিন কোন বিপদে পড়বে কে জানে!

আমি টিশার পাশে বসে রইলাম, টিশাও চুপচাপ বসে রইল। আমি বললাম, "তুমি খাচ্ছ না কেন? খাও।"

টিশা বলল, "হ্যাঁ খাব।" কিন্তু টিশা খেল না, বসেই রইল।

বিকেল বেলা যখন আমাদের কাজ শেষ হলো তখন আমরা সবাই দল বেঁধে পুরোনো জেনারেটরের বিল্ডিং থেকে বের হয়ে এলাম। সবাই গল্প করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে। শুধু টিশা একা একা হাঁটছে। আমি টিশার কাছে গিয়ে বললাম, "টিশা! বিকেল বেলা তুমি কী করবে?"

"কী করব? কিছু না।"

"চলো তাহলে প্রাচীরে যাই।" আমি জানি কংক্রিটের স্তূপ দিয়ে ঘেরাও করে তৈরি করা প্রাচীরে উঠে দূরে তাকিয়ে থাকতে টিশা খুব পছন্দ করে।

টিশার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলল, "চলো, যাই।"

আমরা দুজন তখন ভাঙা ধসে যাওয়া দালান, ইট পাথর কংক্রিটের জঞ্জাল, জং ধরা ভাঙা যন্ত্রপাতি পার হয়ে প্রাচীরের নিচে এসে দাঁড়ালাম। এখানে কংক্রীটের মাঝে ছোট একটা ফাঁক আছে। অনেকদিন আগে আমি আর টিশা এই ফাঁক আবিস্কার করেছি। আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ এই ফাঁকটুকুর কথা জানে না। ইচ্ছে করলে এই ফাঁকটুকু দিয়ে শহর থেকে বের হওয়া সম্ভব–কিন্তু বের হওয়ার কোনো প্রয়োজন হয়নি বলে কখনো বের হওয়ার চেষ্টা করিনি। আমরা একবার ভেতরে উঁকি দিলাম তারপর টিশা কংক্রিটের ভাঙা টুকরোগুলোয় পা দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে প্রাচীরের উপরে উঠে যেতে

থাকে। আমি তার মতো এত সহজে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে পারি না, তাই টিশার পিছু পিছু সাবধানে প্রাচীরের উপর উঠে দাঁড়ালাম। শহরের ভেতর একটা বন্ধ বন্ধ ভাব আছে, উঁচু উঁচু দালানগুলো মনে হয় সবকিছু আটকে রেখেছে। এই প্রাচীরের উপর উঠলে দেখা যায় চারদিক খোলা, যতদূর চোখ যায় শুধু লালচে বালি। মনে হয় আকাশটা একটা বাটির মতো পুরো পৃথিবীটা ঢেকে রেখেছে।

আমি আর টিশা যখন প্রাচীরের উপর হাঁটছি তখন হঠাৎ করে টিশা বলল, "রিহি! দেখো, দেখো।"

আমি মাথা ঘুরে তাকালাম, বহুদূর থেকে ধুলো উড়িয়ে একটা গাড়ি ছুটে আসছে। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম, এর আগে কখনো আমরা কেউ একটা গাড়িকে ছুটে যেতে দেখিনি। বাইরে দস্যুদল, বুনো পশু, কত রকম বিপদ, সেখানে কেউ একা যায় না। যখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে হয় সবাই দল বেঁধে যায়। একসাথে তখন অনেক গাড়ি থাকে। সেই গাড়ির সামনে-পিছে অস্ত্র হাতে প্রহরী থাকে। এখানে কিছু নেই, শুধু একটা গাড়ি। কী আশ্চর্য!

গাড়িটা ধুলা উড়িয়ে ঠিক আমাদের শহরের দিকেই আসছে, দেখতে দেখতে গাড়িটা স্পষ্ট হলো। এটা আমাদের দেখা কোনো গাড়ির মতো না, এটা অন্য রকম গাড়ি। দেখে মনে হয় জোড়াতালি দিয়ে তৈরি করা গাড়ি, ভুল করে তৈরি করা গাড়ি। মনে হয় একটা বড় সাইজের খেলনা গাড়ি। গাড়ির ভেতরে কারা বসে আছে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম না, মনে হয় দস্যুদল। আমরা শুধু দস্যুদলের নাম শুনেছি তাদের সম্পর্কে ভয়ানক ভয়ানক গল্প শুনেছি কিন্তু কখনো তাদেরকে দেখিনি। তাই ভালো করে দেখার জন্য আমরা প্রাচীরের উপর দিয়ে ছুটে যেতে থাকি। দস্যুদল দূর থেকে আমাদেরকে গুলি করে দেবে কি না সেটা নিয়ে একটু ভয় করছিল, তাই চেষ্টা করছিলাম কংক্রিটের আড়ালে আড়ালে থাকতে।

গাড়িটা আমাদের শহরের গেটের দিকে আসছিল। তাই আমি আর টিশাও গেটের কাছাকাছি চলে এলাম। গাড়িটা কাছাকাছি চলে এসেছে এবারে ভেতরেও দেখা যাচ্ছে। স্টিয়ারিং হাতে একজন মাত্র মানুষ—আর কেউ কোথাও নেই। একজন মানুষ একটা অদ্ভুত খেলনা গাড়িতে করে আমাদের শহরের দিকে আসছে। কেন আসছে?

ঠিক তখন আমরা প্রথম গুলির শব্দ শুনলাম, আমাদের শহরের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সেন্ট্রি গুলি করেছে। বিদঘুটে খেলনার মতো গাড়িটা তখন একটা ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল। আমি আর টিশা কংক্রিটের আড়াল থেকে দেখতে পেলাম গাড়ির ভেতর থেকে মানুষটা খুব ধীরেসুস্থে বের হয়ে এল, এবার আমরা তার চেহারা দেখতে পেলাম, মাথায় একটা হ্যাট, মুখে দাড়ি আর গোঁফ। তার কাঁধে বিচিত্র একটা পাখি বসে আছে। মানুষটা গাড়ির ভেতর থেকে একটা ছোট লাঠি বের করল, লাঠির মাথায় এক টুকরো সাদা কাপড় বেঁধে একটা পতাকার মতো তৈরি করল, তারপর সেটা নাড়াতে নাড়াতে হেঁটে হেঁটে গেটের দিকে আসতে থাকে। মানুষটার ভেতরে কোনো ভয়-ডর নেই, কোনো দুশ্চিন্তা নেই।

আমি অবাক হয়ে বললাম, "সাদা পতাকা দিয়ে কী করছে মানুষটা?"

টিশা বলল, "সাদা পতাকা হচ্ছে শান্তির পতাকা। মানুষটা বোঝাতে চাইছে সে মারামারি করতে আসেনি।"

"তুমি কেমন করে জান?"

"আমি বইয়ে পড়েছি।"

"মানুষটার কাঁধে ওটা কী পাখি?"

টিশা বলল, "বাজপাখি"

"কেন?"

"শখ। আগে মানুষ বাজপাখি পুষত।"

আমি আর টিশা কংক্রিটের পেছনে ঘাপটি মেরে বসে কী হয় দেখতে থাকি। মানুষটা পতাকা দুলিয়ে দুলিয়ে কাছে আসতে থাকে। তখন গেট থেকে সেন্ট্রি চিৎকার করে বলল, "দাঁড়াও।"

মানুষটা দাঁড়িয়ে গেল। সেন্ট্রি বলল, "আর কাছে আসবে না। খবরদার।"

মানুষটা মাথা নেড়ে রাজি হয়ে সেখানে পা ছড়িয়ে বসে গেল। আমরা দেখলাম মানুষটার বিদঘুটে গাড়ির ভেতর থেকে দুটো কুকুর লাফ দিয়ে নেমে এদিক-সেদিক গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে তার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। মানুষটার কাছে এসে কুকুর দুটো তার শরীর ঘেঁষে বসে পড়ল। মানুষটা তখন কুকুরগুলোর মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে থাকে।

সেন্ট্রিগুলো যখন দেখল মানুষটা একা, তার সাথে কোনো অস্ত্র নেই, সঙ্গী হচ্ছে একটা পাখি আর দুটো কুকুর তখন তারা অনুমান করল একে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তখন তারা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে নিয়ে লোকটার কাছে গেল, তার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলল, আমরা দূর থেকে তাদের কথাগুলো ঠিক শুনতে পেলাম না। একটু পরে দেখলাম মানুষটা উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের শহরের গেটের দিকে হেঁটে হেঁটে আসছে, তার পিছু পিছু দুটি কুকুর অলস ভঙ্গিতে হাঁটছে। আমাদের শহরের সেন্ট্রিরা তাদের ভয়ংকর স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র মানুষটার দিকে তাক করে ধরে রেখেছে।

টিশা বলল, "চলো যাই।"

"কোথায়?"

"নিচে। দেখি মানুষটা কী করে।"

আমি বললাম, "তুমি ভেবেছ মানুষটা কী করে সেটা তোমাকে দেখতে দেবে? নিশ্চয়ই কমান্ড্যান্টের কাছে নিয়ে যাচ্ছে।"

"নিলে নেবে। আমাদের কাছে যেতে না দিলে চলে আসব। সমস্যা কোথায়?" কথা শেষ করে আমি কী বলি সেটার জন্য অপেক্ষা না করে টিশা কংক্রিটের টুকরোর উপর লাফ দিতে দিতে নিচে নামতে থাকে। আমি আর কী করব? তার পিছু পিছু নামতে শুরু করলাম।

গেটের কাছাকাছি গিয়ে দেখি সেখানে মানুষের ছোটখাটো একটা জটলা। মনে হচ্ছে এই মানুষটার খবর পেয়ে অনেকেই মজা দেখতে চলে এসেছে। আমি আর টিশাও মানুষের ভিড়ের মাঝে মিশে গিয়ে কী হচ্ছে দেখার চেষ্টা করলাম।

দূর থেকে মানুষটাকে যত বিচিত্র মনে হয়েছিল, কাছে থেকে তাকে আরো বিচিত্র মনে হলো। মাথার হ্যাটটা খুলে পেছনে ঝুলিয়ে নিয়েছে। মাথায় লম্বা চুল ঝুঁটির মতো বেঁধে রেখেছে। মুখ বোঝাই কাঁচাপাকা দাড়ি আর গোঁফ। রোদে পোড়া চেহারা, শুধু চোখ দুটো কেমন জানি ঝকঝক করছে। খাকি একটা শার্ট, ভুসভুসে খাকি প্যান্ট। পায়ের জুতো খুবই অদ্ভুত, আমরা কখনো এরকম জুতো দেখিনি। মনে হয় গাড়ির টায়ার কেটে নিজেই তৈরি করে নিয়েছে।

একজন জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ?"

মানুষটা বলল, "আমি যাযাবর।"

যাযাবর শব্দটার অর্থ বেশির ভাগ মানুষ বুঝতে পারল না। আমিও বুঝতে পারলাম না, টিশার দিকে তাকালাম, টিশা ফিসফিস করে বলল, "যারা ঘুরে বেড়ায় তারা যাযাবর।"

"ঘুরে বেড়ায়?"

"হ্যাঁ"

"ঘুরে কী করে?"

"কিছু করে না।"

আরেকজন জিজ্ঞেস করল, "তুমি এখানে কেন এসেছ?"

তখন সেন্ট্রি তার অস্ত্র ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "কোনো কথা না। কমান্ড্যান্ট আসার আগে কোনো কথা না।"

আমাদেরকে তাড়িয়ে না দিয়ে শুধু কথা বলতে নিষেধ করেছে, তাতেই আমরা খুশি।

কিছুক্ষণের মাঝেই কমান্ড্যান্ট আর তার সাথে দুজন সহকারী চলে এল। একজন রুপালি চুলের মহিলা অন্যজন কঠিন চেহারার একজন পুরুষ। কমান্ড্যান্ট আমাদের এভাবে জটলা করে থাকতে দেখে একটু বিরক্ত হলো কিন্তু চলে যেতে বলল না। সোজাসুজি বিচিত্র মানুষটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে কয়েক সেকেন্ড তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। ঠিক কী কারণ জানা নেই তখন কুকুর দুটো উঠে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় চাপা গর্জন করল। ঘাড়ে বসে থাকা বাজপাখিটাও প্রথমবার মাথা ঘুরিয়ে চারদিকে দেখে ডানা ঝাপটে তীক্ষ্ণ এক ধরনের শব্দ করল।

কমান্ড্যান্ট যাযাবর মানুষটিকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী চাও?"

মানুষটি বলল, "আমি কিছু চাই না।"

"তাহলে কেন এসেছ?"

"এমনি।"

কমান্ড্যান্ট কঠিন গলায় বলল, "এমনি কেউ আসে না।"

যাযাবর মানুষটি সহৃদয় ভঙ্গিতে হাসল, বলল, "আমি আসি!"

"কেন?"

"আমি ঘুরে বেড়াই। ঘুরে ঘুরে দেখি। দেখাতেই আমার আনন্দ। দূর থেকে দেখলাম তোমাদের শহর, তাই দেখতে এসেছি।"

কমান্ড্যান্ট কেমন যেন অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, বলল, "আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না।"

যাযাবর মানুষটা আবার সহৃদয় ভঙ্গিতে হাসল, বলল, "তোমাকে আমার কথা বিশ্বাস করতে হবে না। আমি তোমাকে আমার কথা বিশ্বাস করতেও বলব না।"

কমান্ড্যান্ট মুখ আরো শক্ত করে বলল, "তুমি আসলে দস্যুদলের গুপ্তচর। তুমি আমাদের শহরের ভেতরে খোঁজ নিতে এসেছ।"

মানুষটা হাসি হাসি মুখে বলল, "তুমি যদি তাই বিশ্বাস করতে চাও, আমার কোনো সমস্যা নেই।"

"তোমাকে আমরা অ্যারেস্ট করব।"

"করতে চাইলে করো। আমার জন্য সেটাও হবে এক ধরনের অভিজ্ঞতা। আমি কখনো কোথাও অ্যারেস্ট হইনি।"

কমান্ড্যান্ট তখন কেমন যেন কথা বলার উৎসাহ হারিয়ে ফেলল। হতাশভাবে মাথা নেড়ে বলল, "তুমি কী চাও ঠিক করে বলো।"

বিচিত্র মানুষটা প্রথমবার গম্ভীর মুখে বলল, "আমি কিছু চাই না। যদি অনুমতি দাও তোমাদের শহরটা দেখব। যদি না দাও, এখানে এক-দুইদিন বসে থাকব, রাত্রে আগুন জ্বালিয়ে গিটার বাজিয়ে তোমাদের গান শোনাব। যদি সেটাও না চাও চলে যাব।" মানুষটা এক মুহূর্ত থেমে বলল, "আর, তুমি যদি চাও তাহলে—"

"তাহলে কী?"

"আমি তোমাদের ভাঙা অকেজো গাড়ি বাইক লরি এসব ঠিক করে দিতে পারি। আমি খুব ভালো গাড়ির মেকানিক।"

কমান্ড্যান্ট মাথা নাড়ল, "তার কোনো প্রয়োজন নেই। আমাদের ক্রেনিয়াল লাগানো মানুষ আছে। যে কোনো বিষয়ে আমরা তথ্য মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দিতে পারি।"

বিচিত্র মানুষটা কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে হাসতে থাকে। কমান্ড্যান্ট ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "কী হলো? তুমি এভাবে হাসছ কেন?"

"এমনি! তোমাদের ক্রেনিয়ালের বাইরে অনেক তথ্য আছে! যেগুলো অভিজ্ঞতা থেকে জানতে হয়। ক্রেনিয়াল লাগানো ইঞ্জিনিয়াররা যে গাড়ি ঠিক করতে পারেনি সেরকম একটা গাড়ি নিয়ে এসো, আমি তোমাকে দেখাই।"

"তোমাকে কিছু দেখাতে হবে না।" কমান্ড্যান্ট কিছুক্ষণ কিছু-একটা চিন্তা করে বলল, "ঠিক আছে, তোমাকে আমি চব্বিশ ঘণ্টা

এখানে থাকার অনুমতি দিলাম, কিন্তু তোমাকে কয়েকটা আদেশ মানতে হবে।"

"কী আদেশ?"

"তুমি এখানেই বসে থাকবে, শহরের ভেতরে ঢুকতে পারবে না।"

"ঢুকব না।"

"গানবাজনা হইহুল্লোড় চলবে না।"

"ঠিক আছে।"

"তোমার এই ঘেয়ো কুকুর আর প্যাঁচা—"

"এটা প্যাঁচা না। এটা বাজপাখি।"

"যাই হোক, এই জন্তু-জানোয়ার শহরের সীমানার বাইরে রাখবে। আমি চাই না এগুলো এখানে রোগ-জীবাণু আর ব্যাকটেরিয়া ছড়াক।"

মানুষটি হেসে ফেলল। জিজ্ঞেস করল, "আর কিছু?"

"শহরের মানুষের সাথে কোনো গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর চলবে না। কোনো ষড়যন্ত্র কোনোরকম গুজব ছড়ানো চলবে না।"

মানুষটাকে এবারে একটু দুশ্চিন্তিত দেখাল, বলল, "তার মানে আমি কারো সাথে কথা বলতে পারব না?"

"কথা বলতে পারবে কিন্তু গুজব ছড়াতে পারবে না।"

"কিন্তু কোনটাকে তোমরা কথাবার্তা বলবে আর কোনটাকে তোমরা গুজব বলবে, আমি সেটা কেমন করে বুঝব?"

"তোমার বুঝতে হবে না। তোমার সব কথাবার্তা আমরা মনিটর করব। যখন দেখবে তোমাকে ঘাড় ধরে বের করে দিচ্ছি, বুঝবে তুমি গুজব ছড়াচ্ছ।"

মানুষটি মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিক আছে।"

BDeBooks.com

৪.

মানুষের ভিড় একটুখানি কমতেই টিশা আমাকে নিয়ে যাযাবর মানুষটার কাছে গেল। যাযাবর মানুষটি তখন একটা ভাঙা দেয়ালে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে আছে। তার অনেকগুলো পকেটের একটা পকেট থেকে ছোট এক টুকরো গাছের ডাল বের করেছে। অন্য পকেট থেকে একটা ছোট চাকু, তারপর চাকু দিয়ে কাঠের ডালটা চেঁছে চেঁছে একটা দাবার গুটি তৈরি করার চেষ্টা করতে থাকে।

আমাদের দেখে মানুষটা মাথা তুলে তাকিয়ে একটু হাসল। দাড়ি গোঁফের ফাঁক দিয়ে ভালো দেখা যায় না, কিন্তু যেটুকু দেখা গেল মনে হলো মানুষটির দাঁতগুলো খুবই সুন্দর। আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "শুভ বিকেল।"

আমি বললাম, "শুভ বিকেল।"

টিশা বলল "তোমার নাম কী?"

মানুষটা একটু অবাক হয়ে টিশার দিকে তাকাল, বলল, "নাম? আমার নাম?"

"হ্যাঁ।"

"কী আশ্চর্য! আমার যে একটা নাম ছিল আমি ভুলেই গেছি! কত দিন হয়ে গেল, কেউ আমাকে আমার নাম ধরে ডাকে না! আমি একা থাকি, একা ঘুরে বেড়াই, কে আমাকে আমার নাম ধরে ডাকবে!"

টিশা কী বলবে বুঝতে পারল না, একটা সহজ প্রশ্নের একরকম জটিল উত্তর হবে সে আশা করেনি। ইতস্তত করে বলল, "তোমার নিশ্চয়ই একটা নাম ছিল!"

"হ্যাঁ। হ্যাঁ। আমার একটা নাম ছিল। আমার মা আমাকে ডাকত জিরন। এখন নিশ্চয়ই আমার নাম হবে যাযাবর জিরন। ছোট করে বলতে পার যাযারন!" মানুষটা নিজেই তার নতুন নামটা কয়েকবার উচ্চারণ করল, মনে হলো তার বেশ পছন্দ হলো। তারপর মাথা নেড়ে বলল, "আমাকে তুমি যাযারন ডাকতে পার।"

টিশা বলল, "ঠিক আছে যাযারন, আমি তোমার কাছে জানতে চাই, তুমি যে বাইরে ঘুরে বেড়াও, তোমার কোনো বিপদ হয় না? বাইরে দস্যুরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, বন্য পশু আছে, মাটিতে এতো রেডিয়েশান।"

যাযাবর জিরন যার নতুন নাম হয়েছে যাযারন, মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ আমার নানারকম বিপদ হয়, কিন্তু আমি বিপদের মাঝে টিকে থাকা শিখে গেছি।"

"দস্যুরা যখন তোমাকে আক্রমণ করে তখন তুমি কী কর?"

"আমি কখনো দস্যুদের সামনে পড়ি না। তারা অনেক বড় কনভয় নিয়ে ভয়ংকর বাজনা বাজাতে বাজাতে দল বেঁধে আসে। আমি তখন আমার গাড়ি ফেলে সরে পড়ি।"

"তারা কী খুব ভয়ানক?"

যাযারন মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ।"

"তারা কী ডাকাতি করে?"

"মানুষ।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "মানুষ?"

"হ্যাঁ, তাদের দল বড় করার জন্য তাদের মানুষ দরকার।"

টিশা জিজ্ঞেস করল, "বনের পশু যখন তোমাকে আক্রমণ করে তখন তুমি কী কর?"

"বনের পশু আমাকে আক্রমণ করে না।"

"কেন আক্রমণ করে না?"

"বনের পশু মানুষের মতো না। প্রয়োজন না হলে তারা কখনো আক্রমণ করে না! আমাকে বনের পশুর কোনো প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া—"

"তা ছাড়া কী?"

"তা ছাড়া আমি মানুষ। আমার বুদ্ধিমত্তা বনের পশু থেকে অনেক বেশি। আমি যদি সামান্য একটা পশুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে না পারি তাহলে আমার বেঁচে থাকার দরকার কী?"

টিশা কিছুক্ষণ কিছু একটা চিন্তা করল, তারপর বলল, "বাইরে যে ভয়ংকর রেডিয়েশান সেটা থেকে তুমি নিজেকে কীভাবে রক্ষা কর?"

"করি না।"

"কর না?"

"না।"

"তার মানে বাইরে রেডিয়েশান নেই?"

"হয়তো আছে, কিন্তু আমি হয়তো সেখানে যাইনি। যেখানে গাছ বেঁচে থাকে পশু পাখি বেঁচে থাকে সেখানে মানুষও বেঁচে থাকে।"

যাযারন একটু হেসে জিজ্ঞেস করল, "তোমার আর কোনো প্রশ্ন আছে মেয়ে?"

"হ্যাঁ। আমার শেষ প্রশ্ন। তুমি কী খাও?"

"এই পৃথিবী এক সময় দশ বিলিয়ন মানুষকে খাওয়াত। এখন পৃথিবীতে কত মানুষ বেঁচে আছে? কয়েক হাজার? কয়েক লক্ষ? এদের খাওয়া নিয়ে সমস্যা?"

"তুমি কী খাও?"

"আমি সব খাই। হাতের কাছে কোনো খাবার না থাকলে পোকা ভাজা করে খেয়েছি! পোকা খুব পুষ্টিকর খাবার।"

যাযারনের কথা শুনে টিশা হেসে ফেলল। আমি এতক্ষণ দুজনের কথা শুনছিলাম, এবারে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি যে একা একা ঘুরে বেড়াও কখনো নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হয় না?"

এই প্রথম যাযারন উত্তর দেবার আগে কী যেন ভাবল, তারপর বলল, "হ্যাঁ। মাঝে মাঝে আমার একাকী লাগে। সে জন্য আমি দুটো কুকুর পুষেছি। আমার সাথে একটা বাজপাখি থাকে।" যাযারন

আকাশের দিকে তাকাল, আমরা দেখলাম আকাশে তার বাজপাখিটি ডানা মেলে উড়ছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি সত্যিই যে কোনো নষ্ট গাড়ি ঠিক করতে পার?"

"বড় কোনো সমস্যা না থাকলে পারি।"

টিশা আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আমি যদি একটা নষ্ট মোটর বাইক নিয়ে আসি তুমি ঠিক করে দিতে পারবে?"

"নিয়ে এসো, দেখি পারি কি না।"

ঘণ্টা খানেক পর টিশা যন্ত্রপাতির জঞ্জাল থেকে একটা অচল মোটর বাইক ঠেলে ঠেলে নিয়ে এল। যাযারন খানিকক্ষণ সেটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বলল, "আমার সাথে তো যন্ত্রপাতি নেই, সব আমার গাড়িতে রয়ে গেছে। তুমি কি আমার জন্য এক টুকরো তার নিয়ে আসতে পারবে?"

টিশা মাথা নাড়ল, তারপর আমরা দুজন যন্ত্রপাতির জঞ্জাল ঘেঁটে নানা আকারের ছোট-বড় তার নিয়ে হাজির হলাম। যাযারন মোটর বাইকের কোথা থেকে টেনে একটা টিউব বের করে তার ভেতর সরু তার ঢুকিয়ে কিছুক্ষণ টানাটানি করে তারপর আবার টিউবটা আগের জায়গায় লাগিয়ে দিয়ে মোটর বাইকটা স্টার্ট করার চেষ্টা করল, দুবার বন্ধ হয়ে গিয়ে তৃতীয়বার পুরোপুরি স্টার্ট হয়ে গেল। যাযারন মোটর বাইকটা টিশার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "নাও, তুমি এখন একটি মোটর বাইকের মালিক।"

আমরা অবাক হয়ে যাযারনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। টিশা বলল, "তুমি কীভাবে এত সহজে এটা ঠিক করে ফেললে?"

"কীভাবে ঠিক করতে হবে জানলে তুমিও পারবে।"

টিশা আগ্রহ নিয়ে বলল, "আমাকে শেখাবে তুমি?"

যাযারন তার দাড়িগোঁফের ফাঁক দিয়ে একটু হেসে টিশার মাথায় হাত রেখে বলল, "চব্বিশ ঘণ্টায় আমি তোমাকে আর কতটুকু শেখাব? তোমার আগ্রহ থাকলে তুমি নিজেই শিখে নেবে। শিখতে হয়

গোড়া থেকে, উপর থেকে নয়। ক্রেনিয়ালের এটা হচ্ছে সমস্যা, তারা উপর থেকে শেখায়।"

এতক্ষণে অন্ধকার নেমে এসেছে, আমাদের মতো আরো কিছু মানুষ যাযারনকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। আমাদের মতো তাদেরও নানা ধরনের কৌতূহল। আমি আর টিশা তাই সরে দাঁড়ালাম। যাবার আগে টিশা বলল, "যাযারন, কাল খুব ভোরে আমি চলে আসব। তোমার কাছে আমার আরো অনেক কিছু জানার আছে।"

যাযারন বলল, "চলে এসো। যদি পার এক মগ গরম কফি নিয়ে এসো।"

টিশা মাথা নাড়ল, বলল, "আনব।"

টিশার মোটর বাইকের পেছনে বসে আমরা দুজন শহরের ভেতরে ফিরে এলাম।

পরদিন খুব ভোরে কাজে ফাঁকি দিয়ে এক মগ গরম কফি নিয়ে টিশার সাথে সাথে আমিও শহরের গেটে যাযারনের সাথে দেখা করতে এলাম। এসে দেখি কেউ নেই। কাছাকাছি কমবয়সী একজন সেন্ট্রি দাঁড়িয়ে ছিল, সে বলল, "ঐ পাগলটাকে খুঁজছ?"

"হ্যাঁ। কোথায় সে?"

"কাল রাতে তাকে শহর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে।"

টিশা অবাক হয়ে বলল, "সে কী! কেন?"

"বসে বসে গুজব ছড়াচ্ছিল সে জন্য।"

"কী গুজব ছড়াচ্ছিল?"

"জানি না। নিশ্চয়ই কোনো বদ মতলব ছিল।"

মাঝবয়সী আরেকজন সেন্ট্রি এসে বলল, "তাড়িয়ে দেওয়া ঠিক হয়নি। অ্যারেস্ট করে ডিটিউন করে রেখে দেওয়া উচিত ছিল।"

কমবয়সী সেন্ট্রি জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, ডিটিউন করে রেখে দেওয়া উচিত ছিল।"

টিশা কোনো কথা বলল না, খুব লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

৫.

পরদিন টিশা কাজে এল না। আমাদের মতো মানুষদের কাজে না আসা খুব গুরুতর ব্যাপার, কেন আসেনি তার একশ রকম কৈফিয়ত দিতে হয়। কৈফিয়ত পছন্দ না হলে নানারকম উপদেশ দেওয়া হয়, সেই উপদেশ শাস্তি থেকেও ভয়ংকর। উপদেশে কাজ না হলে সত্যিকারের শাস্তি দেওয়া হয়—শাস্তিটা কী ধরনের সে সম্পর্কে আমরা শুধু ভাসা ভাসা শুনেছি; সঠিক ধারণা নেই। শুধু এটুকু জানি শাস্তি দেওয়ার পর কেউ ঠিক হয়ে যায়নি, এরকম কোনো উদাহরণ নেই।

তাই টিশা যখন কাজে এল না আমি তখন দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। আমরা অনেকে একসাথে কাজ করি, তাই ব্যাপারটা অন্য কারো চোখে পড়েনি। টিশা একা একা থাকে, সে যে আজ কাজে আসেনি সেটা কেউ লক্ষ করবে না আমি আগেই জানতাম।

সারাটি দিন আমি এক ধরনের দুশ্চিন্তা নিয়ে কাটালাম। বিকেল বেলা কাজ শেষ হওয়ামাত্র আমি টিশাদের বাসায় হাজির হয়েছি। বারো তলা বাসা, আটতলার একটা ছোট ফ্ল্যাটে টিশা তার মাকে নিয়ে থাকে। আমি আগে এক-দুইবার তাদের ফ্ল্যাটে এসেছি। টিশার মা অনেকটা টিশার মতোন, চুল ছোট করে কাটা, খুব কম কথা বলে, চোখের দৃষ্টি কেমন জানি তীব্র।

দরজায় শব্দ করতেই টিশা দরজা খুলে দিল, বলল, "এসো। ভেতরে এসো রিহি।" তার কথা শুনে মনে হলো সে যেন আমার জন্যই অপেক্ষা করছিল।

আমি ভেতরে ঢুকলাম। টিশা দরজা বন্ধ করে বলল, "আমার মা এখনো বাসায় আসেনি। কিছুক্ষণের মাঝে চলে আসবে। মা চলে আসার আগে আমি তোমার সাথে একটু কথা বলতে চাই।"

"কী কথা?"

রান্নাঘরে খাবার টেবিলের পাশে চেয়ারটাতে বসার আগেই টিশা বলল, "তোমার মনে আছে মাথায় ক্রেনিয়াল লাগানোর জন্য লুক আর হুনাকেও নিয়ে গিয়েছিল, তাদের আর দেখা যায়নি?"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "মনে আছে।"

টিশা বলল, "তাদের কী হয়েছে আমি বের করেছি।"

আমি ভয়ানকভাবে চমকে উঠলাম, জিজ্ঞেস করলাম, "কী বের করেছ?"

টিশা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে কিছু-একটা দেখে আমার দিকে ঘুরে তাকাল, "লুক আর হুনার কী হয়েছে।"

"কী হয়েছে?"

"তাদের মাথায় বাই-ক্রেনিয়াল লাগিয়েছে।"

"বাই-ক্রেনিয়াল? সেটা কী?"

"ক্রেনিয়াল লাগালে মাথার ভেতরে শুধু তথ্য দেওয়া যায়। বাই-ক্রেনিয়াল হলে দুটো ইন্টারফেস লাগানো হয়। তখন যে রকম তথ্য দেয়া যায় সে রকম তথ্য নেওয়া যায়।"

"তারা এখন কোথায়?"

"এত দিন এখানে হাসপাতালে ছিল। আজ ভোরে একটা কনভয়ের সাথে তাদেরকে অন্য শহরে পাঠিয়ে দিয়েছে।"

"তারা যেতে রাজি হয়েছে?"

টিশা হাসার ভঙ্গি করল, সেই হাসিতে বিন্দুমাত্র আনন্দ নেই। বলল, "তোমার ধারণা তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য আছে? নেই। আমি যতদূর জানি, বাই-ক্রেনিয়াল লাগানোর পর তাদের জ্ঞান ফেরেনি। কিংবা জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টাও করা হয়নি।"

আমি নিজের ভেতর এক ধরনের আতঙ্ক অনুভব করতে থাকি, আতঙ্কটুকু ঠিক কী নিয়ে বুঝতে পারছিলাম না। টিশাকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কেমন করে এত কিছু জেনেছ?"

টিশা জানালা দিয়ে আবার বাইরে তাকাল, তারপর আবার মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাল, বলল, "কাজটা খুব সহজ ছিল না। আমি অনেক দিন থেকে জানার চেষ্টা করছিলাম। লুক আর হুনার মায়ের সাথে কথা বলেছি। কুশ, মিকি আর ক্রিটনের সাথে কথা বলেছি। হাসপাতালের লোকজনের সাথে কথা বলেছি। আর—"

"আর কী?"

"কিছু বেআইনি কাজ করেছি।"

আমার বুক কেঁপে উঠল, "কী বেআইনি কাজ?"

তাদের গোপন ভিডিও ডাউনলোড করেছি।"

"কেমন করে করেছ?"

"তোমাকে বললে তুমি বুঝবে না। কেমন করে করতে হয় আমি জানি। ভিডি টিউবে বই পড়ে শিখেছি। আমার মাথায় ক্রেনিয়াল নেই, তাই আমাকে কেউ সন্দেহ করে না। সবাই ধরে নিয়েছে আমি কিছু জানি না। আসলে আমি অনেক কিছু জানি।"

আমি এক ধরনের আতঙ্ক নিয়ে টিশার দিকে তাকিয়ে রইলাম। টিশা বলল, "কী হলো, তুমি আমার দিকে এভাবে তাকিয়ে আছ কেন?"

"তুমি কি জান তুমি যেটা করছ সেটা কত বিপজ্জনক?"

"জানি।"

"যদি তুমি ধরা পড় তাহলে তোমার কী হবে তুমি জান?"

"জানি। আমাকে ডিটিউন করে দেবে।"

"তাহলে?"

"তাহলে কী?"

"তাহলে তুমি এত বড় ঝুঁকি কেন নিচ্ছ?"

টিশা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি এই শহরে আর থাকব না।"

আমি কয়েক সেকেন্ড কোনো কথা বলতে পারলাম না। খানিকক্ষণ চেষ্টা করে বললাম, "তুমি কোথায় যাবে?"

"আমি যাযাবর হয়ে যাব।" টিশা আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল অবিশ্বাস্য এক ধরনের হাসি।

"তুমি যাযাবর হয়ে যাবে?"

"হ্যাঁ।"

"শহর থেকে তুমি বের হবে কেমন করে? তুমি জান না গেট সব সময় বন্ধ থাকে? সেন্ট্রিরা চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দেয়?"

"আমি গেট দিয়ে বের হব না।"

"তাহলে কোন দিক দিয়ে বের হবে?"

"তোমার মনে নেই, প্রাচীরের নিচে একটা ফাঁক আছে? আমি সেই ফাঁক দিয়ে বের হয়ে যাব।"

"তারপর? তুমি হেঁটে হেঁটে কতদূর যাবে? পাঁচ কিলোমিটার যাবার আগে তোমাকে ধরে নিয়ে আসবে।"

"আমি হেঁটে হেঁটে যাব না, আমি মোটর বাইকে যাব। তুমি ভুলে গেছ আমার একটা মোটর বাইক আছে।"

আমি কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। অবাক হয়ে টিশার দিকে তাকিয়ে রইলাম। টিশা বলল, "আমি তোমাকে বলিনি, তাহলে তোমাকেও বিপদে ফেলা হবে। আমি মোটর বাইকে পানি খাবার জমা করেছি। কষ্ট করে একটা অস্ত্র জোগাড় করেছি। কিছু যন্ত্রপাতি ওষুধপত্র, পুরানো একটা ম্যাপ–"

"ম্যাপ?"

"হ্যাঁ, এখান থেকে সোজা উত্তরে গেলে একটা বনভূমি পাবার কথা। সেখানে একটা হ্রদও আছে।"

আমি নিঃশব্দে বসে রইলাম। টিশা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি তোমাকে কেন এসব কথা বলছি জানি না।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "মনে হয় সব মানুষেরই কথা বলার একজন মানুষ থাকতে হয়। তুমি ছাড়া আমার কথা বলার কোনো মানুষ নেই তাই তোমাকে বলছি। কাজটা ঠিক হলো কি না বুঝতে পারছি না।"

ঠিক তখন খুট করে দরজা খুলে টিশার মা ঘরে ঢুকল। আমাকে দেখে একটু ভুরু কুঁচকে তাকাল। আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "টিশা আজকে কাজে যায়নি। তাই একটু দেখতে এসেছিলাম। এখন যাই।"

টিশার মা বলল, "বসো। এক কাপ পানীয় খেয়ে যাও। উত্তেজক পানীয়, তোমাদের বয়সী ছেলেমেয়েদের ভালো লাগবে।"

আমি বললাম, "আরেক দিন খাব। আজকে যাই।"

"টিশা কেন কাজে যায়নি বলেছে?"

আমি কী উত্তর দেব বুঝতে পারলাম না। ইতস্তত করে বললাম, "না মানে, কোনো কিছু নিয়ে ব্যস্ত—"

"হ্যাঁ। সব সময়েই কোনো কিছু নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু কী নিয়ে ব্যস্ত আমি বুঝি না। সব সময়ে মেয়েটাকে নিয়ে ভয়ে ভয়ে থাকি।"

আমি আর কোনো কথা না বলে বিদায় নিয়ে বের হয়ে এলাম। টিশা আমাকে চলন্ত সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিল। টিশাদের বারো তলা দালান থেকে বের হয়ে আমি যখন সরু একটা রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছি তখন আমার পাশ দিয়ে চারজন সশস্ত্র সেন্ট্রি হেঁটে গেল। আমি তখনো বুঝতে পারিনি তারা টিশাকে ধরে নিয়ে যেতে যাচ্ছে। কমিউনের কার্যকরি পরিষদে দুপুর বেলা টিশাকে ডিটিউন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়া হয়েছে।

ঠিক কী কারণ জানা নেই সেই রাতটি আমি বিচিত্র দুঃস্বপ্ন দেখে ছটফট করে কাটিয়ে দিয়েছি। পরদিন ভোরে গিয়ে দেখি আমাদের কর্মী বাহিনী কাজ না করে এখানে-সেখানে জটলা করে নিচু গলায় কথা বলছে। আমি একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে?"

ছেলেটি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি জান না? টিশাকে ডিটিউন করার জন্য ধরে নিয়ে গেছে।"

আমার মাথাটা ঘুরে উঠল। মনে হলো আমার পুরো জগৎটি মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে গেল। চোখের সামনে একটা দৃশ্য ফুটে উঠল, টিশা একটা মপ নিয়ে নর্দমার ময়লা পানি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, চোখের দৃষ্টি স্থির, মুখে কোনো অভিব্যক্তি নেই। আমি তাকে ডাকছি সে আমার দিকে ঘুরে তাকাচ্ছে না, যখন ঘুরে তাকাচ্ছে তখন আমাকে চিনতে পারছে না। মনে হলো আমার বুকের ভেতর কিছু একটা তছনছ হয়ে যাচ্ছে।

ছেলেটি আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল, বলল, "দেখো রিহি, তোমার নিশ্চয়ই খুব খারাপ লাগছে, আমরা দেখেছি তুমি আর টিশা খুব ঘনিষ্ঠ ছিলে কিন্তু কী করবে, মেনে নাও। তা ছাড়া আরো একটা

বিষয় মনে রাখা দরকার, তুমি নিজেও কিন্তু বিপদে আছ। টিশার পর যদি তোমাকে নিয়ে টানাটানি করে...”

ছেলেটি কথা বলে যাচ্ছিল, আমি কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম না। আমি কী করব বুঝতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল ছুটে বের হয়ে যাই কিন্তু আমাদের জেনারেটর ঘরের দরজা তালা মেরে দিয়েছে। কাজ শেষ হবার আগে বের হবার কোনো উপায় নেই।

আমি কীভাবে সারাটি দিন কাটিয়েছি আমি নিজেও জানি না। বিকেলে দরজা খুলে দেওয়ামাত্র আমি বের হয়ে ছুটতে থাকি। টিশাদের বারো তলা বিল্ডিংয়ের নিচে চলন্ত সিঁড়ির উপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে আমি আটতলায় টিশাদের ফ্ল্যাটে হাজির হলাম, দরজায় ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলে গেল। জানালার কাছে টিশার মা পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দরজায় শব্দ শুনে টিশার মা ঘুরে আমার দিকে তাকাল।

আমি হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, “টিশা টিশা—”

টিশার মা বলল, “টিশা নাই। চলে গেছে।”

“কোথায় চলে গেছে?”

“আমি জানি না। কাল তুমি চলে যাবার পর চারজন সেন্ট্রি এসে তাকে ধরে নিয়ে গেছে। টিশা নাকি খুব ভয়ংকর একটা অপরাধ করেছে সেজন্য তাকে ডিটিউন করে দেবে।” টিশার মা এক মুহূর্তের জন্য থামল, তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, “যাদেরকে ডিটিউন করা হয় তাদেরকে শেষবারের মতো তার আপনজনদের সাথে দেখা করার জন্য পাঠানো হয়। টিশাকেও পাঠিয়েছিল। তখন অনেক রাত।”

“টিশা—টিশা কী বলেছে?”

“কিছু বলেনি। সে যেন পালিয়ে যেতে না পারে তাই তার আঙুলে একটা ট্রাকিওশান লাগিয়ে দিয়েছিল। বাম হাতের কড়ে আঙুলে। লাল রঙের ট্রাকিওশান। বাইরে সেন্ট্রিরা অপেক্ষা করছে, ঘরের ভেতরে আমি আর টিশা।”

আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে বললাম, “তখন?”

"তখন টিশা বলল, মা আমাকে একটা ধারালো চাকু দাও। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন? টিশা বলল আমাকে জিজ্ঞাসা কোরো না। আমি তাকে একটা চাকু দিলাম। সেই চাকু নিয়ে সে তার ঘরে ঢুকে গেল। ঘরে ছিটকিনি লাগিয়ে দিল। বাইরে থেকে আমি শুধু একবার একটা যন্ত্রণার আর্তচিৎকার শুনতে পেলাম।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তারপর?"

শেষ রাতে সেন্ট্রিরা টিশাকে নিতে এল। তার ঘরে ধাক্কা দিল। কেউ দরজা খুলল না। তখন তারা ধাক্কা দিয়ে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে গেল। ভেতরে টিশা নেই। টেবিলের উপর ট্রাকিওশান লাগানো তার বাম হাতের কড়ে আঙুলটি পড়ে আছে। ট্রাকিওশানটা সিগনাল দিয়ে যাচ্ছে। আমার টিশা তার বাম হাতের কড়ে আঙুল কেটে ট্রাকিওশন আলাদা করে জানালার পাইপ বেয়ে নেমে গেছে! কোথায় গেছে কেউ জানে না।" টিশার মা আমার দিকে অদ্ভুত একটা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "তুমি জান রিহি, আমার মেয়ে টিশা কোথায়?"

আমি মাথা নাড়লাম, জানালাম যে আমি জানি না। টিশার মায়ের মুখে খুব বিচিত্র একটা হাসি ফুটে উঠল। আমায় চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি আর কিছু জানতে চাই না। তুমি যাও। আগে হোক পরে হোক ওরা তোমাকে খুঁজে বের করবে।"

আমি টিশাদের ফ্ল্যাট থেকে ছুটে বের হয়ে এলাম। বুকের উপর থেকে একটা পাষাণ নেমে গেছে। ওরা টিশাকে ধরতে পারেনি। আমার টিশা একটা মোটর বাইকে করে মরুভূমির লাল বালু উড়িয়ে ছুটে যাচ্ছে। পৃথিবীর কোনো শক্তি তাকে ধরতে পারবে না। আমার টিশা যাযাবর হয়ে গেছে। আমিও যাযাবর হয়ে যাব। আমি জানি আমাকেও এখন পালাতে হবে। টিশাকে খুঁজে বের করতে হবে।

টিশাদের বাসা থেকে বের হয়ে আমি আমার অনাথ আশ্রমে ফিরে গেলাম না। টিশার একজন মা আছে, আমার কেউ নেই। আমি জন্মের পর থেকে অনাথ আশ্রমে বড় হয়েছি, অনাথ আশ্রমের ছেলেমেয়েগুলো আমার সবকিছু। তাদের কাছ থেকে আমার বিদায় নেয়া দরকার কিন্তু মনে হয় বিদায় নেওয়া হবে না। আমি শহরের শেষ প্রান্তে হেঁটে হেঁটে গিয়ে একটা ধসে যাওয়া দালানে ঢুকে

গেলাম। পুরোটা বিধ্বস্ত হয়ে আছে, ভাঙা যন্ত্রপাতিতে বোঝাই। আমি কোথাও ভাঙা সিঁড়ি কোথাও ভাঙা দেয়াল কোথাও জং ধরা যন্ত্রপাতি বেয়ে উপরে উঠে গেলাম। একটা ফাটলের পাশে বসে আমি পুরো ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার চেষ্টা করলাম। আমাকে খুঁজে খুঁজে যদি সেন্ট্রিরা এখানে চলে আসে আমি এখানে বসে দেখতে পাব, তখন সাবধানে পাশের দালানে সরে যাব। আমার এখন কিছুতেই ধরা পড়া চলবে না। কিছুতেই না।

আমি এর আগে কখনোই ঠান্ডা মাথায় কিছু চিন্তা করে কোনো কাজ করিনি—যখন যেটা ইচ্ছে হয়েছে তখন সেটা করেছি। এই প্রথমবার আমার খুব ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে কাজ করতে হবে।

আমাকে এখান থেকে পালাতে হবে, পালানোর জন্য একটা মোটর বাইক দরকার। মোটর বাইকটা বেশি বড় হতে পারবে না তাহলে প্রাচীরের ছোট ফুটো দিয়ে সেটা বের করা যাবে না। মোটর বাইকে যথেষ্ট পরিমাণ পাওয়ার থাকতে হবে—সেটি অবশ্যি সমস্যা নয়—এক সময় তেল-গ্যাস দিয়ে পৃথিবী চলত তখন পাওয়ার নিয়ে সমস্যা ছিল। এখন তেল-গ্যাস দিয়ে পৃথিবী চলে না, ফিউশান পাওয়ার ব্যবহার শুরু করার পর সারা পৃথিবীর শক্তির সমস্যা মিটে গেছে। শুধুমাত্র পরিত্যক্ত ব্যাটারিতে যে পরিমাণ শক্তি জমা আছে সেটা দিয়েই এই পৃথিবীর মানুষ আরো দু-চারশ বছর টিকে থাকতে পারবে।

শুধু মোটর বাইক হলে হবে না, আমার কিছু শুকনো খাবার দরকার, তার সাথে খাবার পানি। এক-দুটো অস্ত্র হলে আরও নিশ্চিন্ত থাকা যাবে। কোনো রকম ঝামেলা তৈরি না করে কীভাবে এগুলো জোগাড় করা যায় আমি চিন্তা করতে থাকি।

অনেকক্ষণ চিন্তা করেও কোনো রকম ঝামেলা না করে এগুলো জোগাড় করার কোনো সহজ বুদ্ধি খুঁজে পেলাম না। তখন আমি অন্যভাবে চিন্তা করতে থাকলাম, বড় ধরনের ঝামেলা করেই কাজটা করা যাক। কিন্তু কাজটা যেন খুব দ্রুত শেষ করা যায়। সব শেষে অস্ত্র জোগাড় না করে প্রথমেই যদি অস্ত্রটা জোগাড় করি তাহলে সেই অস্ত্র দিয়ে শুকনো খাবার কিংবা পানি জোগাড় করা বিন্দুমাত্র কঠিন কাজ

নয়। সেই অস্ত্র দেখিয়ে কারো কাছ থেকে একটা মোটর বাইক কেড়ে নেওয়া কোনো বড় ধরনের ঝামেলা নয়। আইন না ভেঙে এই কাজগুলো করা মোটেই সহজ নয়। কিন্তু যদি ঠিক করে ফেলি আইনটা যেহেতু ভাংতেই হবে সেটা ঠিকভাবেই ভাঙা হোক তাহলে সবকিছুই খুব সহজ। পুরো পরিকল্পনাটার একটাই সমস্যা, আমি এর আগে কখনো কোনো দিন আইন ভেঙে কিছু করিনি—আজ করতে হবে।

অস্ত্র জোগাড় করার কাজটা সবচেয়ে কঠিন হবার কথা কিন্তু আমার মনে হলো এই কাজটাই হবে সবচেয়ে সহজ। আমি আর টিশা কংক্রিটের প্রাচীরের উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে অনেকবার শহরের মূল গেটের কাছে এসেছি, যে দৃশ্যটা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়েছে সেটি হচ্ছে গেটের সেন্ট্রি গেটে হেলান দিয়ে ঢুলু ঢুলু চোখে বসে আছে। এই গেট কয়েক মাসেও একবারের জন্য খোলা হয় কি না সন্দেহ, তাই সেন্ট্রির কোনো কাজ নেই। কাজেই আধা ঘুমন্ত একজন সেন্ট্রির কাছ থেকে আচমকা একটা অস্ত্র কেড়ে নেওয়া কঠিন হওয়ার কথা নয়। তবে আমার চেহারায় পনেরো বছর বয়সের একটা ছেলের চেহারার ছাপ আছে, সেই ছাপটি রাখা যাবে না। কালিঝুলি মেখে প্রথমে চেহারার মাঝে একটা বীভৎস ভাব আনতে হবে।

কীভাবে পুরো পরিকল্পনাটা কাজে লাগানো হবে সেটি ঠিক করে নেবার পর আমি কাজে লেগে গেলাম। ধসে যাওয়া বিল্ডিংটা খুঁজে খুঁজে কিছু কালিঝুলি বের করে মুখে লাগাতে থাকি। চোখের নিচে, গালে এবং মুখটা ঘিরে কালো রঙের একটা আস্তরণ দিয়ে চেহারার মাঝে একটা ভয়ংকর ভাব ফুটিয়ে আনি। খুঁজে এক টুকরো কটকটে লাল রঙের কাপড়ের টুকরো পেয়ে গেলাম, সেটা মাথায় বেঁধে নিলাম, আয়না নেই বলে নিজেকে দেখতে পাচ্ছিলাম না কিন্তু আমি অনুমান করতে পারছিলাম এখন আমার মোটামুটি একটা ভয়ংকর দর্শন চেহারা হয়েছে।

আমি তখন সাবধানে বিল্ডিং থেকে বের হয়ে কংক্রিটের প্রাচীরের দিকে ছুটতে থাকি। প্রাচীরের কাছাকাছি পৌঁছে কংক্রিটের টুকরোগুলোর আড়ালে থেকে গেটের দিকে এগোতে থাকি। গেটের

কাছাকাছি পৌঁছে আমি মাথা তুলে উঁকি দিলাম। যা ভেবেছিলাম তাই, সেন্ট্রি গেটে হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছে, অস্ত্রটা দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখেছে।

আমি পা টিপে টিপে তার দিকে অগ্রসর হতে থাকি, ঠিক কী কারণ জানা নেই আমি নিজের ভেতর বিন্দুমাত্র ভয়ভীতি টের পেলাম না। নিজের ভেতরে বিচিত্র এক ধরনের আত্মবিশ্বাস। আমি নিশ্চিতভাবে জানি কোনো রকম ঝামেলা ছাড়াই আমি কাজটা শেষ করতে পারব।

সেন্ট্রিটার খুব কাছে পৌঁছানোর পর হঠাৎ কী কারণে সেন্ট্রি চোখ খুলে আমার দিকে তাকাল। আমি তখন আর দেরি না করে এক লাফ দিয়ে তার অস্ত্রটা হাতে তুলে নিয়ে তার দিকে তাক করে বললাম, "দুই হাত উপরে তুলে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ো!"

মানুষটা একটু দ্বিধা করছিল। আমি তখন চিৎকার করে বললাম, "খবরদার! দেরি করলেই গুলি!" শুধু যে কথাটা উচ্চারণ করেছি তা নয় মুহূর্তের জন্য মনে হলো দেরি করলে সত্যি বুঝি গুলি করে দিতে পারব।

মানুষটা তখন সত্যি সত্যি উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল, দুই হাত মাথার উপর উঁচু করে রাখা। আমি কাছে গিয়ে তার বেল্টটা খুলে নিয়ে হাত দুটো পেছনে বেঁধে নিলাম। তারপর তার গলার স্কার্ফটা খুলে সেন্ট্রির মুখটা শক্ত করে বেঁধে দিলাম। নির্জন এই জায়গা থেকে তার ছুটে আসতে দশ পনেরো মিনিট লেগে যাবে, আমাকে তার মাঝে কাজ শেষ করে ফেলতে হবে। অস্ত্রটাকে দেখে অনেক ভারী মনে হয় কিন্তু সেটা আশ্চর্য রকম হালকা। আমি সেটা হাতে নিয়ে রাস্তা ধরে ছুটতে থাকি, প্রথম যে মোটর বাইক চোখে পড়বে সেটা ছিনিয়ে নিতে হবে।

প্রথম মোটর বাইকে একজন মা তার ছোট মেয়েকে পেছনে বসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তাই তাকে ছেড়ে দিলাম। দ্বিতীয় মোটর বাইকে পাহাড়ের মতো বিশাল একজন মানুষ যাচ্ছে, তাকেও ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমার হাতে সময় নেই তাই ছোটখাটো একটা হুংকার দিয়ে তার সামনে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। মানুষটা অবাক হয়ে

মোটর বাইক থামাল, আমি চিৎকার করে বললাম, "নেমে যাও! এই মুহূর্তে, না হলে গুলি করে দেব।"

আমার কথা শুনে মানুষটা এত অবাক হলো যে সেটি বলার মতো নয়, আমাদের এই শহরে এর আগে কখনোই কেউ কারো কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেনি। একজনকে অস্ত্র দিয়ে ভয় দেখিয়ে যে কিছু একটা ছিনিয়ে নেয়া যায় এই শহরের মানুষেরা সেটা জানে না। মানুষটা আমাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল না, মোটর বাইক থেকে নেমে দাঁড়াল।

আমি লাফিয়ে সেটার উপর উঠে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেলাম। বড় কাজ দুটি শেষ, এখন কিছু শুকনো খাবার আর পানি জোগাড় করতে হবে। এই পথে একটা দোকান আছে কিন্তু সেখানে মানুষের ভিড় হবে বলে সেখানে না গিয়ে একটা ছোট অনাথ আশ্রমে হানা দিলাম। আমাকে দেখে সেখানে ছোট শিশুরা আতঙ্কে ছোটাছুটি করতে থাকে, আমার কাজটি সে জন্যে সহজ হয়ে গেল। আমি অস্ত্র উঁচিয়ে চিৎকার করে বললাম, "দশ সেকেন্ডের মাঝে দশ গ্যালন পানি আর দশ কেজি শুকনো খাবার—এক সেকেন্ড দেরি হলে সবাইকে খুন করে ফেলব।"

দশ সেকেন্ডের মাঝে এগুলো দেওয়া সম্ভব না, আমার পক্ষেও কাউকে খুন করা সম্ভব না কিন্তু অনাথ আশ্রমের ম্যানেজার মেয়েটির এগুলো জানার কথা নয়—সে ছোটাছুটি করে খাবার আর পানির প্যাকেট আনতে থাকে।

এক মিনিটের মাঝে আমি সেখান থেকে বের হয়ে প্রাচীরের দিকে ছুটতে থাকি। প্রাচীরের ঠিক কোন জায়গাটিতে গর্ত সেটি আমি বেশ ভালোভাবে জানি। জানি, সেটার উপর ভরসা করেই আমি সেদিকে ছুটে যেতে থাকি।

ঠিক তখন অনেক দূর থেকে সাইরেনের বিকট শব্দ শুনতে পেলাম। আমি আমাদের এই শহরে কখনো কোনো বড় ধরনের অপরাধ ঘটতে দেখিনি। কিছু একটা ঘটে গেলে কী করতে হয় মনে হয় কারো ভালো করে জানা নেই। তাই আমাকে ধাওয়া করার জন্য

সশস্ত্র বাহিনীকে প্রস্তুত করে আনতে বেশ খানিকটা সময় লেগে গিয়েছে।

প্রাচীরের কাছে পৌঁছে আমি যখন গর্তটাকে খুঁজে বের করে তার ভেতরে ঢুকে মোটর বাইকটাকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছি তখন বাইরে সশস্ত্র বাহিনীর গাড়িগুলো হাজির হয়েছে। তারা যখন আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তখন আমি প্রাচীরের অন্য পাশে বের হয়ে গেছি। মোটর বাইকের বাতি নিভিয়ে আমি নিঃশব্দে মরুভূমির লাল বালু উড়িয়ে ছুটে যেতে থাকি।

প্রাচীরের উপর সার্চলাইট জ্বালিয়ে নিরাপত্তা রক্ষা বাহিনী যখন আমাকে খুঁজে বেড়াতে শুরু করেছে তখন আমি শহর থেকে বহুদূরে চলে এসেছি। আমাকে তারা আর কোনো দিন খুঁজে পাবে না।

কিন্তু আমার টিশাকে খুঁজে পেতে হবে। পেতেই হবে।

৬.

আমি টিশাকে খুঁজে বের করতে চাই। এই বিশাল মরুভূমিতে টিশা কোথায় আছে আমি জানি না। শুধু শুনেছি সে একবার বলেছিল উত্তরে একটা বনভূমি আছে, সেখানে একটা হ্রদ আছে, টিশা সেখানে যেতে চায়। তার কাছে নাকি একটা প্রাচীন ম্যাপও আছে—আমার কাছে কিছু নেই। সত্যি কথা বলতে কি আমি উত্তর-দক্ষিণও চিনি না। শুনেছিলাম আকাশে ধ্রুবতারা বলে একটা তারা আছে সেটা উত্তর দিকে থাকে, কিন্তু আমি সেটা চিনি না। টিশা হয়তো বই পড়ে সেটা শিখেছে, আমাকে কেউ শেখায়নি। কাজেই টিশাকে খুঁজতে কোন দিকে যাব আমি জানি না।

যখন মনে হলো আমি শহর থেকে মোটামুটি নিরাপদ দূরত্বে চলে এসেছি তখন আমি আমার মোটর বাইকটা থামালাম। তারপর সেটাতে হেলান দিয়ে বসে ঠাণ্ডা মাথায় একটু চিন্তা করতে চেষ্টা করি। টিশা কোন দিকে গিয়েছে সেটা যেহেতু আমি জানি না, তাই খেয়ালখুশিমতো যে কোনো একদিকে রওনা দিয়ে লাভ নেই। আমি প্রাচীরের যে ফুটো দিয়ে বের হয়েছি, টিশাও সেই ফুটো দিয়ে বের হয়েছে, আমি যে রকম যত তাড়াতাড়ি শহর থেকে যতদূর সরে যাওয়া সম্ভব তার চেষ্টা করেছি, টিশাও নিশ্চয়ই তাই চেষ্টা করেছে। কাজেই মোটামুটি অনুমান করা যায় প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা আগে টিশা এই পথেই এসেছে। এরপর সে কোনদিকে গিয়েছে সেটা অনুমান করার কোনো উপায় নেই। টিশাকে খুঁজে বের করার আমি একটামাত্র উপায় চিন্তা করে বের করতে পারলাম, নরম বালুর উপর তার মোটর বাইকের টায়ারের চিহ্ন নিশ্চয়ই এখনো মুছে যায়নি। আমি যদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে

দেখি তাহলে নিশ্চয়ই সেটা খুঁজে বের করতে পারব। সেটা যদি খুঁজে বের করতে পারি তাহলে সেটা ধরে এগিয়ে গেলে আগে হোক পরে হোক নিশ্চয়ই টিশাকে বের করে ফেলতে পারব।

রাতের অন্ধকারে টিশার মোটর বাইকের টায়ারের চিহ্ন খুঁজে বের করা খুব কঠিন, দিনের আলোতে সেটা অনেক সহজ। কিন্তু যতই দেরি হবে টিশা নিশ্চয়ই আরো বেশি দূরে চলে যাবে—কাজেই আমার হাতে নষ্ট করার মতো সময় একেবারেই নেই। আমি তাই দেরি না করে তখন তখনই কাজে লেগে গেলাম।

মোটর বাইকের হেডলাইট জ্বালাতেই সামনে অনেকখানি জায়গা আলোকিত হয়ে গেল। আমি তখন হাঁটুতে ভর দিয়ে বালুর উপর টায়ারের চিহ্ন খুঁজতে থাকি। কাজটি কঠিন কিন্তু আমি হাল ছেড়ে দিলাম না, নিজের ভেতর কেমন যেন বিশ্বাস ছিল যে আগে হোক পরে হোক আমি টিশার মোটর বাইকের টায়ারের চিহ্ন খুঁজে পাবই।

কোথা থেকে শুরু করেছি সেটা মনে রাখার জন্য সেখানে অনেকগুলো ছোট-বড় পাথরের টুকরো জমা করে একটা বৃত্ত তৈরি করে রাখলাম। যেদিক থেকে এসেছি সেদিকে একটা তিরচিহ্ন দিয়ে আমি তার সাথে লম্বভাবে টিশার মোটর বাইকের টায়ারের চিহ্ন খুঁজতে থাকি। খানিকটা দূরত্ব খোঁজা হলে আমি মোটর বাইকটা ঠেলে আরেকটু সামনে নিয়ে গিয়ে তার হেডলাইটের আলোতে আবার খুঁজতে থাকি।

এভাবে কত ঘণ্টা খুঁজেছি জানি না। একসময় আমার পিঠ এবং ঘাড় ব্যথা করতে থাকে। ঠিক কী কারণ জানা নেই আমার সে রকম খিদে পায়নি কিন্তু তারপরেও আমি একটু শুকনো খাবার এবং অল্প এক ঢোক পানি খেয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বালুর উপর শুয়ে থাকলাম। ঝকঝকে পরিষ্কার আকাশে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র, আমি অবাক হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকি। আমাদের ঘিঞ্জি শহরের কেউ কখনো আকাশের দিকে তাকিয়ে কখনো কোনো নক্ষত্র দেখেছে বলে মনে হয় না।

এই প্রত্যেকটা নক্ষত্রের নাকি একটি করে নাম রয়েছে—আমি একটিরও নাম জানি না। কে জানে টিশা হয়তো এই নক্ষত্রগুলোর কোনো কোনোটির নাম জানে। আমি ঠিক মাথার উপরে মিটমিট করে

জ্বলতে থাকা একটা নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিশ্চয়ই একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ কেন জানি আমার ঘুম ভেঙে গেল, আমি উঠে বসলাম এবং দেখলাম আমার কাছাকাছি অন্ধকারে একা প্রাণী দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে প্রাণীটাকে চেনা যায় না কিন্তু তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। আমি ভয়ে আতঙ্কে উঠে বসতেই প্রাণীটা দুই পা পিছিয়ে গেল কিন্তু একেবারে সরে গেল না। স্থির দৃষ্টিতে সেটি আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি কাঁধ থেকে অস্ত্রটা নিয়ে জন্তুটার দিকে তাক করতেই সেটা হঠাৎ করে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

আমি আবার বালুতে শুয়ে আকাশের দিকে তাকালাম। ঠিক মাথার উপর মিটমিট করে জ্বলতে থাকা উজ্জ্বল নীলাভ নক্ষত্রটি সেখানে নেই। কী আশ্চর্য, সেটি কোথায় চলে গেল? একটু মাথা ঘোরাতেই সেটাকে পেয়ে গেলাম। নক্ষত্রটি একটু বাম দিকে হেলে গেছে। কী আশ্চর্য, কেউ আমাকে কখনো বলেনি চাঁদ এবং সূর্যের মতো নক্ষত্রও আকাশে এক দিক থেকে অন্যদিকে হেলে পড়ে। আমি এই সহজ বিষয়টাও জানতাম না—টিশা নিশ্চয়ই জানে!

আমি আবার উঠে মরুভূমির বালুতে টিশার মোটর বাইকের টায়ারের চিহ্ন খুঁজতে শুরু করি। যত কষ্টই হোক, যত কঠিনই হোক আমি সেটা খুঁজে বের করবই করব।

আমি কতক্ষণ এভাবে খুঁজেছি জানি না। যখন পূর্ব আকাশ একটু একটু আলো হতে শুরু করেছে তখন আমার প্রথম মনে হলো আমি বালুতে খুব হালকা একটা টায়ারের দাগ দেখতে পেয়েছি। আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাগটা পরীক্ষা করলাম, যদি সত্যি এটা টিশার মোটর বাইকের টায়ারের চিহ্ন হয়ে থাকে তাহলে সামনে এবং পেছনেও এটা খুঁজে পাওয়া যাবে।

আমি আমার মোটর বাইকটা টেনে কাছে নিয়ে এসে আলোটা সামনের দিকে ছড়িয়ে দিলাম, তারপর সেই আলোতে সামনে গিয়ে টায়ারের দাগটা খুঁজতে থাকি। আমার বুক তখন উত্তেজনায় ধক ধক করছে, মনে হচ্ছে যদি সামনে এর চিহ্ন খুঁজে না পাই? যদি দেখি এটা আসলে মোটর বাইকের টায়ারের চিহ্ন না, এটা আসলে অন্য কিছু?

আমি বিড় বিড় করে নিজেকে বললাম, "এটা যদি নাও হয় ক্ষতি নেই। আমি তবু খোঁজা বন্ধ করব না। আমি খুঁজতে থাকব, খুঁজতে

থাকব আর খুঁজতে থাকব। যতক্ষণ টিশাকে খুঁজে না পাব আমি খোঁজা থামাব না।"

মোটর বাইকের হেডলাইটের আলোতে আমি সামনে এগিয়ে গেলাম, সত্যি সত্যি নরম বালুতে আমি আবার মোটর বাইকের টায়ারের দাগ পেয়ে গেলাম। আমার বুকে রক্ত ছলাত করে উঠল, উত্তেজনায় আমার নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। আমি মোটর বাইক টেনে আরো সামনে নিয়ে গেলাম, আরো সামনে খুঁজে আবার মোটর বাইকের টায়ারের চিহ্ন পেলাম। টিশা যে হালকা ছোট একটা মোটর বাইক নিয়েছে এটা ঠিক সে রকম মোটর বাইকের টায়ারের চিহ্ন।

আমি তখন বালুতে বসে পড়লাম। হাঁটুতে ভর দিয়ে বালুর উপর সাবধানে এই চিহ্ন খুঁজে বের করা গেছে কিন্তু এই চিহ্ন ধরে মোটর বাইক চালিয়ে যেতে হলে আরো আলো দরকার। আমাকে সূর্য ওঠার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আমি মোটর বাইকের হেডলাইট নিভিয়ে তার পাশে বালুতে শুয়ে পড়লাম। সারারাত ঘুমাইনি, কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিলে খারাপ হয় না। উত্তেজনায় আমার বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড ধক ধক করছে, আমি ভেবেছিলাম আমার চোখে ঘুম আসবে না। কিন্তু নরম বালুর উপর মাথা রাখতেই রাতের মরুভূমির শীতল বাতাস আমার সারা শরীর জুড়িয়ে দিল এবং কিছু বোঝার আগেই আমার দুই চোখে ঘুম নেমে এল।

আমি কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না, হঠাৎ করে আমার ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙার পরও পুরোপুরি জেগে উঠতে আমার খানিকক্ষণ সময় লাগে, আজকে কিন্তু আমি মুহূর্তে পুরোপুরি জেগে উঠলাম। পূর্ব আকাশে সূর্য উঠে দিগন্তের উপরে চলে এসেছে। চারিদিকে একটা নরম আলো, আমি জানি দেখতে দেখতে এটা ভয়ংকর উত্তপ্ত একটা দিনে পাল্টে যাবে। আমি আমার খাবারের প্যাকেট থেকে এক টুকরো শুকনো রুটি আর প্রোটিনের টুকরো বের করে চিবিয়ে খেয়ে নিলাম। তারপর পানির বোতল থেকে খুব সাবধানে দুই ঢোক পানি খেলাম। তারপর মোটর বাইকে উঠে সেটা নিয়ে ছুটে চললাম।

টিশার টায়ারের চিহ্ন ধরে আমি ছুটে যেতে থাকি। বালুর উপর টায়ারের চিহ্ন কোথাও স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট। যখন পাথুরে এলাকা আসে তখন হঠাৎ করে টায়ারের চিহ্ন থাকে না। তখন মোটর বাইক

থেকে নেমে আবার ভালো করে খুঁজতে হয়। আমি মোটর বাইকের চিহ্ন ধরে যেতে যেতে ধীরে ধীরে টিশার মোটর বাইক চালানোর কায়দাটুকু মোটামুটি বুঝে ফেলেছি। ঘণ্টা দুয়েক চালানোর পর সে মোটর বাইক থামিয়ে বিশ্রাম নেয়। রোদ যখন কড়া হয়ে উঠেছে তখন সে বড় বড় পাথরের ছায়ার আড়ালে বিশ্রাম নিয়েছে। এক জায়গায় তাকে বালুতে শুয়ে পড়তেও দেখেছি। হাতের একটা আঙুল কেটে ফেলে এসেছে, রক্তপাত বন্ধ করার জন্য সে ছেঁড়া কাপড় দিয়ে হাত বেঁধে রেখেছে। রক্তে মাখামাখি সে রকম ছেঁড়া কাপড়ের টুকরোও পেয়েছি।

মোটর বাইক চালিয়ে যেতে যেতে টিশা যে ধীরে ধীরে ক্লান্ত হয়ে গেছে সেটাও আমি বুঝতে পেরেছি। তার মোটর বাইকের গতি কমে এসেছে, সোজা না গিয়ে সে এলোমেলোভাবে গিয়েছে। একটু পরপর বিশ্রাম নিয়েছে। আমি বুকের ভেতর টিশার জন্য অদ্ভুত এক ধরনের মায়া অনুভব করতে থাকি। আগে কখনোই আমি কারো জন্য এরকম অনুভব করিনি।

ধীরে ধীরে রোদটা মাথার উপর উঠে এল। প্রচণ্ড গরমে আমার জিব শুকিয়ে আসে, মনে হয় যতটুকু পানি আছে সেটা ঢক ঢক করে খেয়ে ফেলি। কিন্তু আমি খেলাম না, উঁচু হয়ে থাকা একটা বড় পাথরের ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে দুই ঢোক পানি খেয়ে আবার ছুটে যেতে থাকি।

আমি এক ধরনের শঙ্কা নিয়ে লক্ষ করলাম ধীরে ধীরে টিশার মোটর বাইক চালানোটুকু এলোমেলো হতে শুরু করেছে, সে কোন দিকে যাচ্ছে মনে হয় যেন নিজেও ভালো করে জানে না—শুধু তাই নয় একসময় মনে হলো সে বৃত্তাকারে ঘুরছে। এক জায়গায় মনে হলো সে একটা পাথরে ধাক্কা খেয়ে নিচে পড়ে গেছে। মনে হলো সে কিছুক্ষণ নিচে পড়ে ছিল, তারপর কষ্ট করে উঠেছে, আবার খানিকদূর গিয়েছে, আবার থেমেছে। আবার গিয়েছে।

আমি নিজেও আর যেতে পারছিলাম না। মরুভূমির ভয়ংকর রোদ থেকে রক্ষা করার জন্য কিছু আনিনি। গরম বাতাস আগুনের হলকার মতো আমার চোখে-মুখে লাগছে। প্রচণ্ড তৃষ্ণায় আমার বুক ফেটে যেতে চাইছে। খুব সাবধানে মুখে কয়েক ফোঁটা পানি দিয়েছি—

আমি পানি খেয়ে শেষ করতে চাই না। আমি যদি টিশাকে খুঁজে পাই তাহলে এই পানি আমার থেকে বেশি দরকার হবে টিশার।

আমি রোদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য একটা বড় পাথরের ছায়ায় দাঁড়ালাম। প্রচণ্ড রোদে চারদিক ঝলসে যাচ্ছে। দিগন্ত-বিস্তৃত বালু ধিকি ধিকি করে কাঁপছে। আমি দূরে তাকালাম, হঠাৎ মনে হলো বহুদূরে বালুতে কিছু একটা চকচক করছে। আমি চমকে উঠলাম—ওটা কি টিশার মোটর বাইক, নাকি আমার চোখের ভুল? এতদূর থেকে সেটা স্পষ্ট দেখা যায় না, শুধু রোদে মাঝে মাঝে একটুখানি চকচক করছে। আমি আর দেরি না করে মোটর বাইকে উঠে প্রায় গুলির মতো ছুটে যেতে থাকি, যতই কাছে যেতে থাকি ততই জিনিসটা স্পষ্ট হতে থাকে এবং কিছুক্ষণের মাঝেই বুঝে গেলাম এটা আসলেই টিশার মোটর বাইক, কাত হয়ে পড়ে আছে। আমি কাছে গিয়ে থামলাম, টিশার পায়ের ছাপ। মোটর বাইক থেকে নেমে সে এলোমেলোভাবে হেঁটে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কাছাকাছি অনেকগুলো বড় বড় পাথরের স্তূপ। টিশা নিশ্চয়ই এই পাথরের আড়ালে একটু ছায়ার মাঝে আশ্রয় নিয়েছে। আমি আমার মোটর বাইক থামিয়ে চিৎকার করে ডাকলাম, "টিশা! টি—শা..."

কোনো প্রত্যুত্তর শোনা যায় কি না তার জন্য আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম কিন্তু কিছু শুনতে পেলাম না। আবার আমি গলা ফাটিয়ে ডাকলাম, কেউ উত্তর দিল না। তখন আমি পাথরের স্তূপের কাছে ছুটে যেতে থাকি। কাছাকাছি গিয়ে একটু ঘুরতেই আমি টিশাকে দেখতে পেলাম, শক্ত পাথরের উপর দুই হাত দুই পাশে ছড়িয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। জীবন আছে কি নেই বোঝা যাচ্ছে না। আমি চিৎকার করতে করতে ছুটে গেলাম, তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে হাতটা ধরলাম, গলার কাছে হাত দিয়ে দেখলাম খুব ক্ষীণভাবে তার পালসটি বোঝা যায়। এখনো বেঁচে আছে। টিশার চোখ দুটো বন্ধ, মুখটা অল্প একটু খোলা, শুকনো নীল ঠোঁট। নিঃশ্বাস নিচ্ছে কি নিচ্ছে না বোঝার উপায় নেই।

আমি টিশাকে সেখানে রেখে আবার পাগলের মতো আমার বাইকের কাছে ছুটে গেলাম, সেটাতে বসে আমি চালিয়ে টিশার কাছে নিয়ে আসি। পেছন থেকে খাবার আর পানির বোতলগুলো নিয়ে আমি

টিশার কাছে এলাম। একটা বোতল খুলে সেখান থেকে একটু পানি টিশার মুখের মাঝে ঢেলে দিলাম। হাতে একটু পানি নিয়ে আমি তার মুখটা মুছে দিয়ে চিৎকার করে ডাকলাম, "টিশা! টিশা! একবার তাকাও!"

টিশা তাকাল না। আমি আরো একটু পানি তার মুখে ঢেলে দিলাম, তখন সে প্রথমবার একটু নড়ে উঠল, তার ঠোঁট দুটো একটু কেঁপে উঠল। সে সাবধানে চোখ খুলে তাকাল, আমি তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বললাম, "টিশা! দেখো আমি রিহি!"

টিশা ফিসফিস করে বলল, "রিহি?"

"হ্যাঁ"

টিশা বিড়বিড় করে বলল, "স্বপ্ন এটা স্বপ্ন। এটা সত্যি না।" তারপর আবার তার চোখ বন্ধ করল।

আমি আবার চিৎকার করে বললাম, "এটা স্বপ্ন না টিশা। এটা সত্যি, এই দেখো আমি এসেছি।"

টিশা আবার চোখ খুলে তাকাল, তারপর ফিসফিস করে বলল, "এটা সত্যি?"

"হ্যাঁ, এটা সত্যি।"

"তুমি সত্যি?"

"হ্যাঁ, আমি সত্যি। আমাকে ছুঁয়ে দেখো।"

টিশা তার ডান হাতটা একটুখানি তুলে আমাকে ধরার চেষ্টা করল, পারল না। তখন আমি তার হাতটা শক্ত করে ধরলাম। টিশা বলল, "আমি বেঁচে আছি? আমি মরে যাইনি?"

"না, তুমি মরে যাওনি টিশা। তুমি বেঁচে আছ।"

এই প্রথম টিশা সত্যিকারভাবে আমার চোখের দিকে তাকাল, তারপর বলল "রিহি।"

"বলো টিশা।"

"তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না তো?"

"না। আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না।"

"তুমি আর আমি যাযাবর হয়ে যাব?"

এই প্রথম আমি একটু হাসলাম, বললাম, "আমি আর তুমি যাযাবর হয়ে গেছি টিশা!"

দ্বিতীয় পর্ব

৭.

টিশা গাড়ির ড্রাইভারের সিটে বসে চিৎকার করে বলল, "কানেকশন দাও।"

আমি গাড়ির নিচে শুয়ে ইঞ্জিন থেকে বের করে আনা দুটি তার ধরে রেখেছিলাম। ইনসিলুটেড তারের শেষ মাথা ঘষে তার ধাতব অংশ বের করে রাখা আছে, টিশা তার বই পড়ে পড়ে বের করেছে এই দুটি তার ইঞ্জিন স্টার্ট করার মুহূর্তে স্পর্শ করলে মোটর চালু করার প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ পাবে। আমি এতটা নিশ্চিত নই, তারপরেও টিশার উৎসাহের কারণে পরীক্ষাটা করতে রাজি হয়েছি। সত্যি সত্যি গাড়িটা চালু হয়ে যেন সেটা আমার উপর দিয়ে চলে না যায় সেজন্য চাকাগুলোর মাঝখানে শুয়েছি। টিশা যখন কানেকশন দিতে বলবে তখন কানেকশন দিতে হবে।

আমি গাড়ির নিচে শুয়ে চিৎকার করে বললাম, "দিব কানেকশন?"

"হ্যাঁ দাও।"

আমি দুটো তার ছোঁয়ানো মাত্রই একটা ভয়ংকর স্পার্ক হলো এবং পুরো গাড়িটা মনে হয় জীবন্ত প্রাণীর মতো লাফিয়ে উঠে আমার উপর দিয়ে ছুটে বের হয়ে সামনে একটা বিল্ডিংয়ে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে ভয় পাওয়া গলায় বললাম, "এটা কী হলো? টিশা? তুমি ঠিক আছ?"

আমি টিশার হাসির শব্দ শুনতে পেলাম, হঠাৎ করে একটা গাড়ি চালু হয়ে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ছুটে গিয়ে যদি কোনো কিছুতে ধাক্কা খেয়ে থেমে যায় তাহলে তার ভেতরে কোন বিষয়টা হাসির আমি বুঝতে পারলাম না। টিশা গাড়ির দরজা খুলে বের হয়ে শরীর দুলিয়ে হাসতে লাগল। আমি একটুখানি আতঙ্কিত এবং অনেকখানি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম "কী হলো, তুমি হাসছ কেন?"

"তুমি যদি তোমাকে দেখতে তাহলে তুমিও হাসতে! মাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে আছ, চোখ-মুখে একসাথে ভয়, অবিশ্বাস আর বিস্ময়!"

আমিও হাসলাম, বললাম, "তোমাকে বোঝা খুব মুশকিল টিশা।"

টিশা হঠাৎ করে কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল, বলল, "অন্যদের জন্যে সেটা সত্যি হতে পারে রিহি–তোমার জন্য না! তুমি আমাকে বুঝতে পেরেছ বলে আমি এখনো বেঁচে আছি। টিশা মাইনাস একটা আঙুল, কিন্তু পুরোপুরি আমি। তুমি যদি এসে আমাকে না বাঁচাতে তাহলে এত দিনে আমার হাড়গোড়ও বনের পশুরা চিবিয়ে খেয়ে ফেলত।"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "বনের পশুকে বেশি গালিগালাজ করো না—ওদের জন্য আমরা এখনো টিকে আছি!"

টিশা মাথা নাড়ল এবং হঠাৎ করে আমরা দুজনেই চুপ করে গেলাম। মরুভূমির পাথরের আড়ালে মৃতপ্রায় টিশাকে উদ্ধার করে শেষ পর্যন্ত এই নির্জন পরিত্যক্ত শহরটাতে মোটামুটি নিরাপদ আশ্রয়টা খুঁজে পেতে আমাদের কম কষ্ট করতে হয়নি।

আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে টিশাকে খুঁজে বের করে তাকে একটু সুস্থ করে তুলতে তুলতে আমার পানির পুরো ভান্ডার প্রায় শেষ হয়ে গেল। এক রাতে দুজন যখন একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে রেখে রাতের মরুভূমির তীব্র শীত থেকে উদ্ধার পাবার চেষ্টা করছি তখন হঠাৎ করে আমাদের সামনে একটা বুনো প্রাণী এসে দাঁড়াল, অন্ধকারে তার পুরো আকারটা বোঝা যায় না, শুধু চোখ দুটো জ্বলন্ত

কয়লার মতো জ্বলছে। টিশা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল "প্রাণীটা আমাদের দেখে যাচ্ছে, আমরা মরে গেলে আমাদের ছিঁড়ে খুঁড়ে খাবে।"

আমি কোনো কিছু না ভেবেই বললাম, "এত সোজা নয়! আমাদের খাবার শেষ হয়ে গেলে আমরাই বরং এটাকে ধরে খাব।"

টিশা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি এই প্রাণীটাকে খাবে?"

"সমস্যা কী? আগে কি মানুষ পশুপাখি ধরে কেটেকুটে রান্না করে খেত না? সব সময়েই কি এরকম শুকনো খাবার ছিল?"

টিশা কোনো কথা না বলে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। তখন সেই প্রাণীটা আরো একটু সামনে এগিয়ে এল, আস্তে আস্তে সেটার সাহস বেড়ে যাচ্ছে। টিশা হাত নেড়ে সেটাকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করল, প্রাণীটা এক পা পিছিয়ে গেল কিন্তু সরে গেল না। অন্ধকারে তার জ্বলন্ত চোখ নিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। টিশা বলল, "এটাকে সরিয়ে দাও, আমার ভালো লাগছে না।"

আমি বললাম, "দিচ্ছি।" তারপর শহরের সেন্ট্রির কাছ থেকে কেড়ে আনা অস্ত্রটা হাতে নিয়ে কীভাবে সেটা ব্যবহার করতে হয় বোঝার চেষ্টা করলাম। উপরে একটা ডায়াল, সেটার পাশে কোন মাত্রার বিস্ফোরক ব্যবহার করতে হবে সেটি লেখা। নির্বোধ প্রাণীটাকে বিস্ফোরক দিয়ে হত্যা করার কোনো ইচ্ছে নেই, শুধু ভয় দেখিয়ে সরিয়ে দিতে চাইছি। ডায়ালটার শেষে ছোট করে লেখা ট্রাংকিউলাইজার—যার অর্থ এটাকে প্রাণে মারবে না কিন্তু অচেতন করে ফেলবে। পরীক্ষা করার জন্য এই সেটিংটা খারাপ না। আমি ডায়ালটা ট্রাংকিউলাইজারে টেনে এনে প্রাণীটার দিকে অস্ত্রটা তাক করে ট্রিগারটা টেনে ধরলাম, ধুপ করে একটা চাপা শব্দ হলো আর প্রাণীটা কেমন যেন লাফিয়ে উঠে ছোট একটা যন্ত্রণার শব্দ করল। তারপর ঘুরে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করল কিন্তু বেশিদূর যেতে পারল না, কয়েক পা গিয়েই পা ভেঙে পড়ে গেল।

আমি টিশার দিকে তাকিয়ে বললাম, "এই দেখো প্রাণীটাকে অচেতন করে রেখেছি। আমাদের খাবারের অভাব হলে এটা খেতে পারি।"

টিশা বলল, "আমি প্রাণীটাকে দেখতে চাই।"

আমি আলো জ্বালিয়ে প্রাণীটার কাছে গেলাম, কুকুরের মতো দেখতে একটা প্রাণী। ঘাড়ের কাছে বড় বড় লোম, অচেতন হওয়ার পরও চোখ দুটো খোলা, মুখে ধারালো দাঁত।

টিশা বলল, "প্রাণীটা যথেষ্ট তাজা। এটা নিয়মিত খেতে পায়।"

ঠিক তখন আমার মাথায় একটা চিন্তা খেলা করে গেল। আমি উত্তেজিত গলায় বললাম, "টিশা।"

"কী হয়েছে?"

"বেঁচে থাকার জন্য এই প্রাণীটাকে পানি খেতে হয় না?"

"হ্যাঁ হয়।"

"তার মানে মাঝে মাঝেই এই প্রাণীটা কোথাও না কোথাও পানি খেতে যায়।"

টিশা এক ধরনের উত্তেজনা নিয়ে আমার দিকে তাকাল। কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারল না, তারপর বলল, "যদি আমরা এটার পিছু পিছু যাই তাহলে সেটা কোথায় পানি খেতে যায় খুঁজে বের করতে পারব?"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "হ্যাঁ।"

"আমাদের কাছে যদি ট্রাকিওশান থাকত তাহলে আমরা এটার শরীরে লাগিয়ে দিতাম। কোথায় যায় বের করতে পারতাম!"

আমি বললাম, "আমাদের কাছে ট্রাকিওশান আছে।"

টিশা অবাক হয়ে বলল, "ট্রাকিওশান আছে?"

"হ্যাঁ, একটু প্রাচীন। তোমার পছন্দ হবে কি না জানি না!" বলে আমি আমার ব্যাগ থেকে সুপার পলিমারের একটা দড়ি বের করে টিশার হাতে দিয়ে বললাম, "এটা হবে আমাদের ট্রাকিওশান! প্রাণীটার গলায় দড়ি বেঁধে রাখব, দড়ির অন্য মাথা ধরে আমরা এটার পিছু পিছু যাব!"

আমি কী বলছি বুঝতে টিশার এক মুহূর্ত সময় লাগল। যখন বুঝতে পারল তখন সারা শরীর দুলিয়ে সে হি হি করে হাসতে লাগল। এই মেয়েটা যখন হাসে তখন আমার বুকের ভেতর কী যেন ওলটপালট হয়ে যায়—কোনো দিন সেটা টিশাকে বলতে পারব বলে মনে হয় না।

সকালবেলার দিকে কুকুরের মতো দেখতে প্রাণীটা জেগে উঠে নড়াচড়া শুরু করল। আমরা সেটাকে একটা বড় পাথরের সাথে বেঁধে রেখেছি। ইচ্ছে করে সেটাকে খোলা জায়গায় রেখেছি—ভয়ংকর রোদে নিশ্চয়ই প্রচণ্ড তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠবে, তাই যখন ছেড়ে দেব তখন নিশ্চয়ই প্রথমে পানি খেতে যাবে! গলার দড়ি ধরে তখন আমরা পিছু পিছু যাব!

আমি আর টিশা পাথরের ছায়ায় বসে অপেক্ষা করতে থাকি। মরুভূমির প্রচণ্ড রোদে চারিদিক ধিকিধিকি করে জ্বলছে, প্রাণীটা দীর্ঘ সময় নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করেছে, না পেরে শেষ পর্যন্ত বালুতে মুখ ডুবিয়ে নির্জীবের মতো বসে আছে। প্রাণীটাকে দেখে আমাদের মায়া হচ্ছিল কিন্তু কিছু করার নেই। রোদ কমে না আসা পর্যন্ত আমরা এই প্রাণীটাকে ছেড়ে দিতে পারব না।

সূর্য ঢলে যাবার পর আমরা পাথর থেকে দড়ির বাঁধন খুলে প্রাণীটাকে যেতে দিলাম। সেটা ধুঁকে ধুঁকে এগোতে লাগল। আমি আর টিশা দড়ির অন্য মাথা ধরে সেটার পিছু পিছু যেতে থাকলাম । আমাদের ধারণা ভুল নয়। প্রাণীটা সত্যি সত্যি শুকনো বালু, পাথরের স্তূপ পার হয়ে দীর্ঘ সময় হেঁটে হেঁটে গাছপালা ঢাকা একটা জায়গায় এসে হাজির হলো। বড় একটা পাথরের ফাঁক দিয়ে সেখানে ঝিরঝির করে পানি পড়ছে, পৃথিবীতে এর থেকে সুন্দর কোনো দৃশ্য আছে বলে আমার জানা নেই।

আমরা প্রাণীটিকে প্রাণ ভরে পানি খেতে দিলাম। তারপর তার গলার বাঁধন কেটে সেটিকে ছেড়ে দিলাম। প্রাণীটি পাথরের উপর লাফিয়ে লাফিয়ে গাছপালার ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি আর টিশা তখন ছোট জলাশয়ের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। গত কয়েক দিন

হিসাব করে প্রত্যেক ফোঁটা পানি খেয়েছি, এখন শুধু যে যত ইচ্ছে পানি খেতে পারব তা নয়, ইচ্ছে করলে টলটলে পানিতে সারা শরীর ডুবিয়ে শুয়ে থাকতে পারব।

পানির এই ছোট ঝরনাটা পেয়ে যাবার পর আমাদের বেঁচে থাকার আর কোনো সমস্যা থাকল না। শুধু আমি আর টিশা যে পানির জন্য এখানে এসেছি তা নয়, এই এলাকায় সব পশুপাখি এখানে পানি খেতে আসে। এত দিন আমরা মানুষের জন্য তৈরি করা বিশেষ ধরনের খাবার ছাড়া আর কিছু খাইনি, কিন্তু এখন ইচ্ছে করলে আমরা পশুপাখি ধরে আগুনে ঝলসে খেতে পারব—একসময় তো মানুষ এভাবেই বেঁচে ছিল, আমরা কেন পারব না?

পানির এই ঝরনায় যেহেতু সব রকম জন্তু-জানোয়ার আসে, তার মাঝে সত্যিকারের হিংস্র পশুও থাকতে পারে, তাই আমরা এর কাছাকাছি না থেকে একটু দূরে একটা বড় পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিলাম। বিকেলের দিকে সূর্যের তেজ কমে এলে আমরা মোটর বাইকে করে আশেপাশের এলাকায় পরিত্যক্ত একটা শহর খুঁজে বেড়াতাম। খুঁজে খুঁজে শেষ পর্যন্ত একটা শহর খুঁজে পেয়েছি। এক সময় নিশ্চয়ই অনেক মানুষ থাকত। একটা শহরের মানুষের থাকার জন্য যা যা থাকা দরকার তার সবই আছে। বেশির ভাগ ঘরবাড়ি ভেঙেচুরে গেছে, কিন্তু কিছু কিছু বাসা একেবারে পুরোপুরি অক্ষত। দেখে মনে হয় বুঝি বাসার মানুষগুলো বাইরে গেছে, এক্ষুনি ফিরে আসবে।

এই শহরে যে জিনিসটা পেয়ে টিশার আনন্দের সীমা থাকল না সেটি হচ্ছে বিশাল একটা লাইব্রেরি। ভেতরে সারি সারি ভিডি টিউব সাজানো। শেলফে ছোট ছোট ক্রিস্টালে অসংখ্য বই। টিশা লোভাতুরের মতো সেই বইগুলোতে চোখ বুলাতে থাকে।

একদিন একটা বই দেখে টিশা আনন্দে চিৎকার করে ওঠে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এটা কী?"

"মানুষের মস্তিষ্কের উপর একটা বই।"

মানুষের মস্তিষ্কের উপর একটা বই দেখে এত আনন্দিত হবার কী আছে, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, টিশার অনেক কিছুই আমি

বুঝতে পারি না! টিশা তখন তখনই ভিডি টিউবে ঢুকিয়ে দিয়ে বইটা পড়তে শুরু করে। আমি ভেবেছিলাম তাকে নিয়ে বের হব, কাছাকাছি আরো একটা পানির ঝরনা পাওয়া যেতে পারে বলে মনে হচ্ছে–সেই জায়গাটা একটু দেখে আসব। কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে আপাতত সেই পরিকল্পনা বন্ধ রাখতে হবে।

টিশা কিছুক্ষণ বই পড়ে হঠাৎ করে আমার দিকে তাকাল, বলল, "রিহি তুমি বই পড় না কেন?"

"বই। আমি? বই?"

"হ্যাঁ।"

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, "আমার তো তোমার মতো বই পড়ার অভ্যাস হয়নি।"

"তার মানে তুমি কিছু জান না।"

"জানি। একটা তিতির পাখি কেমন করে ঝলসে খাওয়া যায় জানি। যব দিয়ে কীভাবে রুটি তৈরি করা যায় জানি। মাথার চুল লম্বা হয়ে গেলে কীভাবে কাটতে হয় জানি—"

টিশা প্রায় ধমক দিয়ে বলল, "ঠাট্টা কোরো না। আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছি। তুমি ভেবেছিলে ষোলো বছর বয়স হলে তোমার মাথায় ক্রেনিয়াল লাগাবে, তখন তুমি সবকিছু শিখে নেবে—কিন্তু তুমি আর কোনো দিন শহরে ফিরে যেতে পারবে না। যদি যাও তাহলে তোমার মাথায় মোটেও ক্রেনিয়াল লাগাবে না—তোমাকে ডিটিউন করে দেবে!"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "জানি।"

"তাহলে?"

"তাহলে কী?"

"তাহলে তুমি কেন বই পড়া শুরু কর না? তুমি কেন শিখতে শুরু কর না?"

আমি ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলাম, "পৃথিবীতে এত কিছু শেখার আছে, আমি কোথা থেকে শুরু করব?"

টিশার মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আমাদের নতুন আবিষ্কার করা লাইব্রেরিটা দেখিয়ে বলল, "এখানে খুব মজার কিছু বইয়ের ক্রিস্টাল আছে।"

"কীরকম মজার?"

"প্রাচীনকালে ছেলেমেয়েরা মাথায় ক্রেনিয়াল লাগিয়ে শিখত না। তারা নতুন কিছু শেখার জন্য স্কুলে যেত। কলেজে যেত। সেখানে শিক্ষকেরা তাদের বই থেকে শেখাত। কোন বয়সে কী শিখতে হবে সেগুলো ঠিক করে রাখা ছিল। সেই বইগুলো এই লাইব্রেরিতে আছে, তুমি সেই বইগুলো দিয়ে শুরু করতে পার।"

আমার আসলে টিশার মতো বই পড়ে পড়ে নতুন কিছু শেখার কোনো আগ্রহ নেই। শহরে যখন ছিলাম তখন জীবনটা ছিল খুবই বাঁধাধরা আনন্দহীন ছোট একটা জীবন। টিশার সাথে যাযাবর হয়ে যাবার পর এখন জীবনটা হয়েছে অনেক চমকপ্রদ। শহর থেকে বের হয়ে এই যাযাবর হয়ে যাবার আগে আমি জানতাম না একটা পাখির ডাক শুনেই বোঝা যায় পাখিটা সঙ্গী খুঁজছে। আমি জানতাম না হিংস্র পশু আসলে মোটেও হিংস্র নয়–যখন তাদের খিদে পায় শুধু তখন তারা অন্য কোনো প্রাণীকে হত্যা করে খায়। বই না পড়েই আমি এগুলো শিখেছি কিন্তু টিশার ধারণা এই জিনিস শিখে লাভ নেই! জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখতে হবে, গণিতের জটিল সমীকরণের সমাধান করা শিখতে হবে, তা না হলে একজন মানুষ নাকি মূর্খ থেকে যায়। আমার মূর্খ হয়ে থাকতে কোনো আপত্তি নেই কিন্তু টিশাকে সেটা বোঝাতে পারি না!

শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি টিশা আমাকে দিয়ে বই পড়াতে শুরু করল। প্রথম প্রথম কিছু একটা পড়ে সেটা বুঝতে আমার একটু সমস্যাই হতো কিন্তু আস্তে আস্তে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। গণিতের সমীকরণ সমাধান করতে শুরু করলাম। অণুপরমাণুর গঠন শিখে গেলাম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য জানতে শুরু করলাম। প্রাণিজগতের জিনেটিক কোড জেনে গেলাম, গাড়ির ইঞ্জিন কেমন করে কাজ করে

জেনে গেলাম। মস্তিষ্কে ক্রেনিয়াল না লাগিয়েই যে সবকিছু জেনে যাওয়া যায় আমি সেটা বিশ্বাস করে যখন সত্যি সত্যি অনেক আগ্রহ নিয়ে রীতিমতো টিশার সাথে প্রতিযোগিতা করে লেখাপড়া শুরু করেছি, ঠিক তখন কয়েক ঘণ্টায় আমাদের সবকিছু বন্ধ হয়ে গেল।

আমরা একটা দস্যুদলের হাতে বন্দি হয়ে গেলাম।

৮.

বিকেলবেলা আমি আর টিশা লাইব্রেরিতে বসে পড়াশোনা করছিলাম। একটা প্রোটনের কাছে এনে একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিলে সেটা কেন প্রোটনের ভেতর পড়ে না গিয়ে একটা হাইড্রোজেনের পরমাণু হয়ে যায় সেটা নিয়ে খানিকক্ষণ তর্ক করে আমি লাইব্রেরির জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছি তখন হঠাৎ মনে হলো বহুদূরে একটা ধূলিঝড় শুরু হয়েছে। আমি ধূলির ঝড়টার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ করে নিজের ভেতরে এক ধরনের আতঙ্ক অনুভব করি। এটা কি সত্যিই ধূলিঝড় নাকি একটা কনভয়? দস্যুদলের কনভয়?

আমি টিশাকে ডাকলাম, "টিশা এখানে এসে দেখো!"

আমার গলার স্বরে কিছু একটা ছিল যেটা শুনে টিশা ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কী?"

"মনে হয় একটা কনভয় এদিকে আসছে।"

টিশা জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকাল বহু দূরে ধূলি উড়ছে, সেদিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "হ্যাঁ! একটা কনভয়।"

"কার কনভয়?"

টিশা নিঃশ্বাস আটকে রেখে বলল, "দস্যুদলের।"

"কেমন করে বুঝলে দস্যুদল?"

"ওদের বাজনা শুনতে পাচ্ছ না?"

আমি কান পেতে শোনার চেষ্টা করলাম এবং সত্যি সত্যি বহুদূর থেকে একটা বাজনার শব্দ শুনতে পেলাম, কেমন যেন আতঙ্কের বাজনা।

টিশা বলল, "সব দস্যুদলের নিজস্ব বাজনা থাকে। যখন কোথাও আক্রমণ করতে যায় এরকম বাজনা বাজাতে বাজাতে যায়।"

আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম, তারপর জিজ্ঞেস করলাম, "ওরা কাকে আক্রমণ করতে যাচ্ছে?"

টিশা বলল, "এদিকেই তো আসছে। মনে হয় আমাদের শহরটা আক্রমণ করতে আসছে।"

আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, "আমাদের শহরটাকে? এই শহরে তুমি আর আমি ছাড়া কে আছে?"

"ওরা তো সেটা জানে না।"

আমি আর টিশা জানালা দিয়ে দূরে তাকিয়ে রইলাম, ধীরে ধীরে গাড়িগুলোর আকার বোঝা যেতে শুরু করেছে, বিদঘুটে কদাকার বিশাল বিশাল গাড়ি। দস্যুদলের বাজনাটাও অনেক স্পষ্ট হয়েছে, ভয়ংকর এক ধরনের বাজনা, বুকের ভেতর এক ধরনের কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়।

আমি বললাম, "আমাদের এখনই শহর থেকে পালিয়ে যেতে হবে। দস্যুদল এখানে পৌছানোর আগেই অন্য কোথাও চলে যেতে হবে।"

টিশা মাথা নাড়ল, বলল, "না। তার জন্য দেরি হয়ে গেছে। দস্যুদল ওদের টেলিস্কোপ, মোশান সেন্সর, ভিডি ট্রেসার সবকিছু দিয়ে এই শহরটাকে স্ক্যান করছে। আমরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে দেখে ফেলবে—তখন ওদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না।"

আমি মাথা নাড়লাম, "ঠিকই বলেছ। আমাদের এখানেই লুকিয়ে থাকতে হবে। পুরোপুরি ধসে গেছে এরকম কোনো জায়গায় লুকিয়ে থাকি। এত বড় শহরে আমাদের কখনো খুঁজে পাবে না।"

আমি আর টিশা আর দেরি করলাম না। কিছু শুকনো খাবার আর কয়েকটা পানির বোতল নিয়ে শহরের এক প্রান্তে পুরোপুরি ধসে পড়া একটা বিল্ডিংয়ের কিছু ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে ছোট একটা ঘুপচি ঘরে লুকিয়ে রইলাম। দস্যুদল শহরে ঢুকেই বুঝতে পারবে এটা জনমানবহীন পরিত্যক্ত একটা শহর। তখন শহরের যা কিছু আছে

লুটপাট করে নিয়ে যাবে, আমাদের দুজনকে নিশ্চয়ই খোঁজার চেষ্টা করবে না।

ঘণ্টা খানেকের ভেতরেই দস্যুর দলটা আমাদের শহরে পৌঁছে গেল, ভয়ংকর একটা বাজনা থেকে আমরা সেটা বুঝতে পারলাম। দলটা শহরের ভেতরে ঘুরে বেড়াল, ইতস্তত কিছু গোলাগুলি করল এবং আমরা ছোট-বড় নানাধরনের কিছু বিস্ফোরণের শব্দ শুনলাম।

ভয়ংকর বাজনাটা হঠাৎ থেমে গেল এবং একজন হঠাৎ খনখনে গলায় কথা বলতে শুরু করল। মানুষটার কথা খুবই বিচিত্র, উচ্চারণ বিদঘুটে এবং কথা বলার সময় প্রত্যেকটা শব্দের শেষে হিসহিস করে এক ধরনের শব্দ করে। তার সব কথা আমরা বুঝতে পারলাম না, শুনলাম খনখনে গলায় বলল, "চিকি চিকি চিকি চিকিরি মুঙ্গা আবে কানা লুলা মাজা ভাঙা পার্টনার ক্ষান্তি দে। দম লে বোম ফাটা। আয় এই শহরটা গুঁড়া করে যাই। চিকিরি দুঙ্গা! মনে লয় এই শহরে কুনো ইন্দুর নাই, থাকলেও জানের ভয়ে টিংরি দিছে না হয় গর্তে ঢুকছে। আবে কানা লুলা মাজাভাঙা ভুঁড়ি ফাসা কুত্তার বাচ্চারা খুঁইজা বার কর কারা আছে। কলিজা প্যাকেট কইরা লয়া যাই। চিকি চিকি চিঙ্গিরা! কাম শুরু কর কুত্তার বাচ্চারা। দুনিয়াটা দখল না করলে শান্তি নাই। এখনো একটা নিউকিলিয়ার বুমা খুঁইজা পাইলাম না কামটা কী ঠিক হইল? কুত্তার বাচ্চারা তোরা করস কী? তোগো মগজে আমি কি কেরেনিয়াল লাগাই নাই? সেই মগজে রস দেই নাই? চিকি চিকি চিঙ্গিরা। যখন দরকার পড়ছে তোগো বিপদ আপদ বুমা গুলি বিজলি বাজলা ঘাউ কামুড় থেকে বাঁচাই নাই... "

মানুষটা এই ভাষায় খনখনে গলায় কথা বলেই যেতে লাগল— কথার মাঝে মাঝে দস্যুদলের লোকেরা চিৎকার করতে লাগল, হল্লা করতে লাগল। আমরা কথার কিছু বুঝতে পারলাম, বেশির ভাগ বুঝতে পারলাম না। তবে মোটামুটি একটি জিনিস বুঝতে পারলাম শহরে কোনো মানুষ থাকলে তাদেরকে খুঁজে বের করতে এই দস্যুদল খুবই ব্যস্ত। মানুষকে অবশ্যি মানুষ না বলে ইঁদুর বলছে। যে কোনো কারণেই জীবন্ত মানুষ এদের কাছে খুবই মূল্যবান।

আমি আর টিশা এক ধরনের আতঙ্ক নিয়ে ধসে যাওয়া বিল্ডিংয়ের ধ্বংসস্তূপের খুপরিতে অন্ধকারে মাথা গুঁজে পড়ে রইলাম। বাইরে নানা ধরনের শব্দ হইহল্লা এবং মাঝে মাঝেই গোলাগুলি এবং বিস্ফোরণের শব্দ। কান ফাটানো এক ধরনের বাজনা এবং তার সাথে বিদঘুটে স্বরে গান শুনতে পেলাম। খনখনে গলার মানুষের বিচিত্র ভাষার কথা এবং গালাগাল মাঝে মাঝেই শুনতে হচ্ছিল। সে নিশ্চয়ই এই দস্যুদলের নেতা, সে যখন কথা বলে তখন সবার কথাবার্তা হই হল্লা থেমে যায়।

আমরা কতক্ষণ এভাবে বসেছিলাম জানি না। হঠাৎ করে খুব কাছে থেকে মানুষের গলার শব্দ শুনতে পেলাম। একটা পুরুষ কণ্ঠ বলল, "এই যে এই দিকে গেছে। ইন্দুরের বাচ্চা এই দিকে গেছে।"

আমার বুকটা ধক করে উঠল, তাহলে কি আমাদের খোঁজ পেয়ে গেছে? কেমন করে পেল?

একটা নারীকণ্ঠ বলল, "কুত্তাটাকে শুঁকতে দাও। কুত্তাটা শুঁকে শুঁকে বের করে ফেলবে।"

আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল। দস্যুদল একটা কুকুর নিয়ে এসেছে। কুকুরটা ঘ্রাণ শুঁকে শুঁকে আমাদের বের করে ফেলছে। আমি হাতে অস্ত্রটা টেনে নিলাম, টিশা তখন আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল, ফিসফিস করে বলল, "না। অস্ত্র ব্যবহার কোরো না। দেখা যাক কী হয়।"

আমরা ঘাপটি মেরে বসে রইলাম, পুরুষ এবং মহিলাটি নিচু গলায় কুৎসিত গালি দিতে দিতে এগিয়ে আসতে থাকে এবং কিছুক্ষণের মাঝে ধ্বংসস্তূপটা সরিয়ে আমাদের ঘুপচি ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। ভয়ংকর অস্ত্র হাতে একজন পুরুষ এবং নারী এবং তাদের হাতে শেকল দিয়ে বাঁধা একটা প্রাণী, আবছা অন্ধকারে শুধু অবয়বটা দেখা যায়, চেহারা বোঝা যায় না।

গলায় শেকল বাঁধা প্রাণীটা মাটিতে গন্ধ শুঁকে শুঁকে আমাদের কাছে এগিয়ে এসে গর্জন করে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং

ঠিক তখন পুরুষ এবং মহিলাটি শিকল টেনে ধরে প্রাণীটাকে সরিয়ে আমাদের রক্ষা করল।

আমি আর টিশা হতবাক হয়ে কুকুরের মতো প্রাণীটার দিকে তাকিয়ে রইলাম, কারণ প্রাণীটি একজন মানুষ। কোমরে জড়ানো এক টুকরো পলিমার ছাড়া শরীরে কোনো কাপড় নেই, মাথায় লম্বা চুল, মুখভর্তি দাড়িগোঁফ। শেকল দিয়ে আটকে রেখেছে বলে আমাদের কাছে আসতে পারছে না, দূর থেকে হিংস্র ভঙ্গিতে গর্জন করতে লাগল।

পুরুষ আর নারীটির হাতে তীব্র আলোর দুটো ফ্ল্যাশ লাইট জ্বলে উঠল, তার আলোতে আমাদের চোখ পুরোপুরি ধাঁধিয়ে যায়। আমরা হাত দিয়ে চোখ দুটো ঢাকার চেষ্টা করলাম। পুরুষ মানুষটা বলল, "হাইয়ারে হাইয়া! চিকি চিকি চিকড়া।" মেয়েটা বলল, "একটাও পাই না। এখন দেখি এক জোড়া।"

পুরুষটা বলল, "শুধু এক জোড়া না। একটা বেটা একটা বেটি।"

কুকুরের মতো মানুষটা ছুটে আমাদের দিকে আসার চেষ্টা করে গরগর করে শব্দ করল। পুরুষ মানুষটা শিকলটা শক্ত করে ধরে রেখে বলল, "ইন্দুরের বাচ্চা ইন্দুর গর্ত থেকে বের হ তাড়াতাড়ি।"

আমি কথা বলার চেষ্টা করলাম, বললাম, "তোমরা কী চাও?"

আমার প্রশ্ন শুনে পুরুষ এবং মহিলাটা এমনভাবে হাসতে শুরু করল যেন আমি খুবই হাসির একটা কথা বলে ফেলেছি। পুরুষটা এগিয়ে এসে আমার চুল ধরে টেনে এনে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, "কথা না বলে হাঁটা দে পচা ঘা। একবার মুখ খুললে তোরে আস্ত না নিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে ব্যাগে ভর্তি করে নিব।"

আমি আর কথা বলার চেষ্টা করলাম না। মানুষগুলো একটু ঘুরতেই আমি প্রথমবার তাদের পেছনে ক্রেনিয়ালের ধাতব গর্তগুলো দেখতে পেলাম। কুকুরের মতো মানুষটার পেছনেও ক্রেনিয়াল লাগানো তবে তার ক্রেনিয়ালে একটা টিউব ঢোকানো আছে। টিউবের পেছনে একটা বাতি জ্বলছে এবং নিভছে। নিশ্চয়ই তার মাথার ভেতরে

সরাক্ষণ কোনো রকম তথ্য ঢোকানো হচ্ছে। একজন মানুষকে পুরোপুরি কুকুরের মতো তৈরি করে ফেলা নিশ্চয়ই খুব সহজ না। উল্টোটা কী সম্ভব? একটা কুকুরকে কি মানুষের মতো করা যাবে?

আমি অবশ্যি চিন্তা করার খুব বেশি সময় পেলাম না। তার আগেই দস্যুদলের বিশাল কনভয়ের মাঝে আমাদেরকে নিয়ে এসেছে। শহরের রাস্তায় দস্যুদলের বিশাল এবং বিদঘুটে গাড়িগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখা হয়েছে। গাড়িগুলোর উপর নানা ধরনের যন্ত্রপাতি, নানা ধরনের অস্ত্র। অনেকগুলো গাড়ির উপর বিশাল বিশাল স্পিকার, সেখান থেকে বিচিত্র এক ধরনের বাজনা বাজছে।

দস্যুরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, পুরুষ এবং মহিলা প্রায় সমান সমান। বেশির ভাগই মাঝবয়সী, চেহারার মাঝে এক ধরনের নিষ্ঠুরতার ছাপ। শরীরে নানা ধরনের উল্কি, নাকের মাঝে জিবের মাঝে ধাতব রিং। মরুভূমির গরম আবহাওয়ার জন্যই কিনা কে জানে, তাদের শরীরে কাপড় খুব কম, নগ্নতা নিয়ে তাদের কোনো রকম সংকোচ আছে বলে মনে হয় না।

আমাদের দুজনকে ধরে যখন নিয়ে যাচ্ছে তখন অনেকেই আমাদের দেখার জন্য এগিয়ে এল। তারা আমাদের ধরে টিপে টুপে দেখল। চুল ধরে টানল, হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল, ঘাড়ে ধরে উঁচু করে ওজন আন্দাজ করার চেষ্টা করল। পেটে গুঁতো দিল, একজন মুখ হাঁ করে দাঁতগুলো দেখল। আমাদের মনে হতে লাগল আমরা বুঝি মানুষ নই, আমরা বুঝি জন্তু-জানোয়ার।

কনভয়ের পাশে দিয়ে যখন হেঁটে যাচ্ছি তখন হঠাৎ করে স্পিকারে সেই খনখনে গলায় আওয়াজ শুনতে পেলাম, বিচিত্র দুর্বোধ্য এবং কেমন জানি ভীতিকর। মানুষটি চিৎকার করে বলতে লাগল, ''চিকি চিকি চিংড়া! টিকি টিকি টিংড়া। দুইটা ইন্দুর ধরা পড়েছে! একটা নয় আধাটা না, আস্তো দুইটা ইন্দুর। কানা লুলা মাজাভাঙা কুত্তার বাচ্চারা যারা নিজের চোখে দুইটা ইন্দুর দেখতে চাস আমার খাঁচার মাঝে চলে আয়! আজকে খানি দানি হবে ফুর্তি ফার্তা হবে।

মগজের মাঝে কেরেনিয়াল পরিষ্কার করে রাখবি! আরে রে রে চিকি চিকি চিংড়া! চিকি চিকি চিংড়া!"

আমাদের দুজনকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে একটা লরির সামনে নিয়ে যাওয়া হলো। লরির ভেতর থেকে একজন মানুষ লাফিয়ে বের হয়ে এল। আমাদের কয়েক মুহূর্ত লাগল বুঝতে যে মানুষটি একজন মহিলা। মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। সারা শরীর বিচিত্র উল্কি দিয়ে ঢাকা। শরীরে ছোট ছোট দুই টুকরো নিও পলিমারের কাপড়। গলায় ধাতব একটা মালা, কোমর থেকে একটা যন্ত্র ঝুলছে, বাম হাতের সাথে একটা অস্ত্র স্ট্রাপ দিয়ে বাঁধা।

এই বিচিত্র মহিলাটি আমাদের দুজনের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল, "চিকি চিকি চিকি চিকি চিংড়া চিংড়া!" সাথে সাথে পুরো শহরটি তার খনখনে গলার স্বরে কেঁপে উঠল। মনে হয় তার ভোকাল কর্ডে মাইক্রোফোন লাগানো হয়েছে, যে কথাটিই বলে, পুরো কনভয়ে সেটা শোনা যায়।

মহিলাটি নিশ্চয়ই দস্যুদলের নেতা। সে খপ করে টিশার কাঁধ ধরে নিজের কাছে টেনে আনল, তারপর তার মুখটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল, কানের ভেতর উঁকি দিল, মুখ হাঁ করিয়ে ভেতরে দেখল। তারপর তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে আমার দিকে তাকল, চোখের রং সবুজ, আমি অবাক হয়ে দেখলাম সবুজ চোখ দুটি দেখতে দেখতে লাল হয়ে গেল এবং সেই লাল চোখ দিয়ে মহিলাটি আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি এক ধরনের আতঙ্ক অনুভব করতে থাকি এবং সেই ভয়ংকর চেহারার মহিলাটি হঠাৎ অপ্রকৃতিস্থের মতো হি হি করে হাসতে শুরু করল, আমি অবাক হয়ে লক্ষ করলাম মহিলাটির দাঁতগুলো ধারালো এবং দুই পাশের দুটি দাঁত হিংস্র পশুর মতো বড় বড়। মহিলাটি হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে আমাকেও সরিয়ে দিয়ে চিৎকার করে বলল, "সিস্টিম ডাউনলোড।"

তারপর মনে হয় সিস্টেম ডাউনলোড প্রক্রিয়াটা দেখার জন্যে মহিলাটি লরির একটা ধাতব অংশে বসে পড়ে। আমাদের দুজনকে ঘিরে কয়েকজন দস্যু, কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে ছোটাছুটি করতে থাকে।

বিচিত্র কিছু যন্ত্র নিয়ে আসা হয় এবং সেগুলোর সাথে অন্য যন্ত্র লাগিয়ে সেখান থেকে লম্বা লম্বা তার বের করে আনা হয়। কী হচ্ছে বুঝতে না পেরে আমি আর টিশা এক ধরনের আতঙ্ক নিয়ে যন্ত্রগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকি। মনে হয় মজা দেখার জন্যই বেশ কিছু দস্যু আমাদের দুজনকে ঘিরে দাঁড়াল। পাহাড়ের মতো বড় একজন দস্যু আমাকে ধরে দস্যুদলের নেতা মহিলার দিকে তাকিয়ে বলল, "মায়ী মায়ী, ক্রেনিয়ালে কানেকশন দিব?"

মহিলাটির নাম মায়ী মায়ী নাকি তাকে এই নামে সম্বোধন করা হয় বুঝতে পারলাম না। মহিলাটি মাথা নাড়ল, বলল, "দাও। সিস্টিম ডাউনলোড কর।" তারপর মুখে লোল টানার মতো শব্দ করে বলল, "তিন নম্বর সিস্টিম দিবি।"

পাহাড়ের মতো দস্যুটি মাথা নেড়ে আমার চুলগুলো ধরে আমার মাথার পিছনে তাকাল, মনে হলো সেখানে ক্রেনিয়ালটা খুঁজল, কিন্তু না পেয়ে অবাক হয়ে বলল, "ক্রেনিয়াল কই?"

আমি বললাম, "আমার মাথায় ক্রেনিয়াল লাগানো হয়নি।"

মানুষটি চিৎকার করে বলল, "কী বললি? মগজে ক্রেনিয়াল নাই?"

আমি মাথা নাড়লাম, "না।"

দস্যুদলের নেতা মহিলাটি যাকে মায়ী মায়ী বলে সম্বোধন করা হচ্ছে প্রায় লাফ দিয়ে উঠে আমার কাছে এসে আমার মাথার পেছনে দেখল, তারপর টিশার মাথার পিছনে দেখল। দুজনের কারো মাথাতেই ক্রেনিয়াল নেই, মায়ী মায়ী প্রথমে খুব অবাক হলো, তারপর রেগে উঠল, তারপর হঠাৎ শব্দ করে হাসতে শুরু করল! হাসতে হাসতে বলল, "এই কানা লুলা মাজা ভাঙা কুত্তার বাচ্চারা, তোরা শুনলে বেকুব হয়ে যাবি! দুইটা ইন্দুরের বাচ্চাকে ধরে এনেছি তাদের মাথায় কেরেনিয়াল নাই।" কোনো একটা বিচিত্র কারণে মায়ী মায়ী নামের মহিলাটি ক্রেনিয়াল উচ্চারণ করতে পারে না, এটাকে বলে কেরেনিয়াল! কথা শেষ করার আগেই মায়ী মায়ী অপ্রকৃতিস্থের মতো

হি হি করে হাসতে থাকে। বিশাল স্পিকারে সেই বিচিত্র হাসি সারা শহরে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

পাহাড়ের মতো মানুষটা বলল, "মায়ী মায়ী, এখন এই দুইটারে কী করব?"

"একটা খাঁচার ভেতরে আটকে রাখ।"

পাহাড়ের মতো মানুষটা সত্যি সত্যি আমাদের দুজনকে একটা খাঁচার ভেতরে ঢুকিয়ে খাঁচাটা একটা গাড়ি থেকে বের হওয়া ধাতব দণ্ড থেকে ঝুলিয়ে দিল। আমরা মাটি থেকে প্রায় দশ মিটার উপরে ঝুলতে থাকলাম।

উপর থেকে পুরো কনভয়টা দেখা যায়। সন্ধে নেমে আসছে, বিদঘুটে গাড়ির সামনে ছোট ছোট আগুন জ্বালানো হয়েছে, পুরো এলাকাটা ধোঁয়ায় ভরে গেছে। দস্যুদলের মানুষগুলো আগুন ঘিরে বসে হাসি-তামাশা করতে লাগল। আমি টিশার দিকে তাকিয়ে বললাম, "টিশা।"

"বলো।"

"এখানে কী হচ্ছে বুঝতে পারছ টিশা।"

"একটু একটু বুঝতে পারছি।"

"আমাদের এখন কী হবে বলে মনে হয়?"

টিশা বলল, "ডিটিউন হওয়া ভালো ছিল নাকি এটা ভালো হলো বুঝতে পারছি না।"

কথাটা মোটেও হাসির কথা নয় কিন্তু টিশা হঠাৎ হাসতে শুরু করল। আমাকে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, "এরকম একটা অবস্থা হবে জানলে তুমি কি আমাকে উদ্ধার করতে আসতে?"

আমি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, "মনে হয় আসতাম।"

টিশা বলল, "চমৎকার। খুব খারাপ হলে দস্যু হয়ে থাকতে হবে। যাযাবর হতে গিয়ে দস্যু হয়ে গেলাম, খারাপ কী?"

কথা শেষ করে টিশা আবার হাসতে থাকে। আমি অবাক হয়ে এই বিচিত্র মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকি।

৯.

অন্ধকার হওয়ার সাথে সাথে ঠান্ডা পড়ে গেল। আমাদেরকে একটা খাঁচার ভেতরে ভরে শূন্যে ঝুলিয়ে রেখেছে, সেখানে কনকনে ঠান্ডা বাতাসে আমি আর টিশা শীতে ঠকঠক করে কাঁপছি। গত কয়েক ঘণ্টায় এত কিছু ঘটে গেছে যে আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা মনেই থাকার কথা ছিল না কিন্তু কী কারণ কে জানে আমাদের ভয়ানক খিদে পেয়েছে। কেউ আমাদের মনে করে কোনো খাবার দেবে কি না বুঝতে পারছিলাম না। উপায় না দেখে নিচে দিয়ে হেঁটে যাওয়া একটা দস্যুকে ডেকে তাকে খাবারের কথা বলার চেষ্টা করলাম। দস্যুটা নিচে দাঁড়িয়ে আমার কথা শুনল, তারপর রাস্তা থেকে একটা পাথর তুলে আমাদের দিকে ছুড়ে মারল, খাঁচার শিকে লেগে পাথরটা ভেঙে টুকরো টুকরো না হয়ে গেলে আমাদের কপালে দুঃখ ছিল।

আমরা তখন আর কাউকে কিছু বলার সাহস পেলাম না। খাঁচার ভেতরে শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে গুটিশুটি মেরে একজন আরেকজনকে ধরে একটু উষ্ণ হওয়ার চেষ্টা করতে করতে বসে রইলাম। রাত একটু গভীর হওয়ার পর আকাশে একটা বড় চাঁদ উঠল। একসময় চাঁদ দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিতাম, এখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি। চাঁদ কেন ওঠে, কেন বড় হয় ছোট হয়, কেন চন্দ্রগ্রহণ হয়, কেন চাঁদের একটি পৃষ্ঠই আমরা দেখি অন্যটা কেন দেখি না, এই সবকিছু কিছু বই পড়ে শিখেছি। এখন চাঁদ দেখতে ভালো লাগে। চাঁদের নরম আলোতে নিচে দস্যুদলের কনভয়টাকেও অন্য রকম দেখাচ্ছিল, কেন জানি মোটেও ভয়ংকর মনে হচ্ছিল না।

আমি টিশাকে ডাকলাম, "টিশা।"

"বলো।"

"কী সুন্দর চাঁদ উঠেছে দেখেছ?"

"দেখেছি।"

"একটা গান গাইবে?"

ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, আতঙ্কিত, শীতার্ত অবস্থায় একটা খাঁচায় আটকা থেকে শূন্যে ঝুলতে ঝুলতে কেউ কখনো গান গাইবার কথা চিন্তা করে না। এটা বড়জোর একটা উৎকট রসিকতা হতে পারে। আমার কথা শুনে টিশা আমার নাকের উপর একটা ঘুষি মেরে বসলেও আমি অবাক হতাম না। কিন্তু টিশা আমার নাকে ঘুষি মারল না, জোছনার আলোতে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সত্যি সত্যি খুবই মৃদু স্বরে গান গাইতে লাগল। একজন মহাকাশচারী তার প্রেমিকাকে পৃথিবীতে রেখে চাঁদের দিকে উড়ে যাচ্ছে, প্রেমিকা সেই চাঁদের দিকে তাকিয়ে জোছনার আলোকে বলছে তার প্রেমিকার কাছে একটা খবর পৌঁছে দিতে। খুবই করুণ একটা গান, টিশার গলায় সেটা আরো করুণ শোনাতে লাগল।

আমাদের খাঁচার নিচ দিয়ে একজন দস্যু যাচ্ছিল, গান শুনে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, টিশা ভয় পেয়ে সাথে সাথে গান বন্ধ করে দিল।

নিচ থেকে দস্যুটি বলল, "কী হলো? থামলে কেন? গাও।" একজন মেয়ের কণ্ঠস্বর।

টিশা বলল, "গাইব?"

"হ্যাঁ। গাও। তোমার কণ্ঠস্বরে কম্পনের সুষম অবস্থান খুব ভালো।"

টিশা তখন আবার গাইতে শুরু করল। দস্যু মেয়েটি খাঁচার নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গানটি শুনল। তারপর একটা গাড়িতে হেলান দিয়ে বসে বলল, "এই মেয়ে, আরেকটা গান গাও।"

টিশা তখন আরেকটা গান শুরু করল, দস্যু মেয়েটি সেই গানটিও শুনল, কনকনে ঠান্ডা বাতাসে টিশা মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছিল, দস্যু মেয়েটি সেটাও লক্ষ করল। গান শেষ হবার পর জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কি খেয়েছ?"

টিশা মাথা নাড়ল, বলল, "না।"

দস্যু মেয়েটি বলল, "তোমরা দাঁড়াও, আমি তোমাদের জন্য একটু খাবার, পানীয় আর দুটো গরম পোশাক নিয়ে আসি।"

কিছুক্ষণ পর দস্যু মেয়েটি সত্যি সত্যি আমাদের জন্যে শুকনো খাবারের প্যাকেট, পানীয়ের বোতল আর দুটো গরম পোশাক নিয়ে এল। আমাদের খাঁচাটা নিচে নামিয়ে সে শিকের ফাঁক দিয়ে খাবারের প্যাকেট, পানীয়ের বোতল আর গরম পোশাক দুটো ঢুকিয়ে দিল। আমরা উষ্ণতার ডায়ালে একটা আরামদায়ক উষ্ণতা ঠিক করে তাড়াতাড়ি পোশাক দুটো পরে নিলাম। খাবারের প্যাকেটটা খুলতে খুলতে আমি বললাম, "তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।"

"তোমাদের মাথায় ক্রেনিয়াল নেই, এই খাবার তোমাদের কাছে খুব বিস্বাদ মনে হবে।"

টিশা জিজ্ঞেস করল, "তোমরা খাবার সময় ক্রেনিয়াল দিয়ে মস্তিষ্কে খাবারের স্বাদের অনুভূতি তৈরি করে নাও?"

দস্যু মেয়েটি মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। আমাদের জীবন খুব আনন্দের, আমরা ক্রেনিয়াল দিয়ে যখন ইচ্ছা তখন মস্তিষ্কে আনন্দের অনুভূতি তৈরি করতে পারি।"

টিশা বলল, "তুমি ইচ্ছে করলেই তোমার ক্রেনিয়াল দিয়ে তোমার মস্তিষ্কে অপূর্ব একটা সঙ্গীতের অনুভূতি তৈরি করে নিতে পারতে। সেটা না করে তুমি কেন আমার গলায় গান শুনতে চাইলে?"

দস্যু মেয়েটি একটি নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি জানি না। মনে হয় আমার স্মৃতিতে এরকম একটা মধুর স্মৃতি ছিল। মায়ী মায়ীর দলে যোগ দেবার পর সব পুরোনো স্মৃতি মুছে দিয়ে দস্যু হওয়ার স্মৃতি ঢোকানো হয়েছে, তারপরেও মনে হয় মস্তিষ্কের কোথাও এই ধরনের কিছু স্মৃতি লুকিয়ে আছে।"

টিশা বলল, "তুমি মোটেও অন্য দস্যুদের মতো নও।"

"আমার ক্রেনিয়াল দিয়ে সিস্টেম পাঁচ ডাউনলোড করেছে। সিস্টেম সাত ডাউনলোড করলে আমি অন্য দস্যুদের মতো হয়ে যাব।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কি অন্য দস্যুদের মতো হতে চাও।"

দস্যু মেয়েটি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "হ্যাঁ। হতে চাই। সিস্টেম পাঁচ দিয়ে আনন্দের তীব্রতা বেশি করা যায় না। সিস্টেম সাত আট নয় দিয়ে আনন্দের তীব্রতা অনেক বেশি। মায়ী মায়ীর সিস্টেম হচ্ছে সতের। আমাদের আর কারো সতের নেই।"

টিশা জিজ্ঞেস করল, "তুমি কেমন করে দস্যুদলে যোগ দিয়েছ?"

দস্যু মেয়েটি বলল, "আমার মস্তিষ্ক থেকে সেই স্মৃতি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি কোথা থেকে এসেছি আমি জানি না।" মেয়েটি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "তোমাদের মাথায় যদি ক্রেনিয়াল থাকত তাহলে তোমাদের স্মৃতিও মুছে দেওয়া হতো। এতক্ষণে তোমরাও দস্যু হয়ে যেতে।"

ঠিক কী জন্য জানি না আমি কেমন জানি শিউরে উঠলাম। মেয়েটা বলল, "তোমরা খেয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করো। কাল সকালে তোমাদের নিশ্চয়ই অনেক ধকল সহ্য করতে হবে। ক্রেনিয়াল থাকলে কোনো সমস্যা হতো না।"

মেয়েটি যখন আমাদের খাঁচাটি উপরে তুলছে তখন টিশা জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম কী?"

"আমার নাম প্রিমা তিন। প্রিমা এক আর দুই আগে এসেছে, তাদের সিস্টেম এগারো।"

টিশা বলল, "প্রিমা তিন, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।" মেয়েটি বলল, "আমি যখন তোমার গান শুনছিলাম তখন খুব আশ্চর্য একটা ব্যাপার ঘটেছে। হঠাৎ করে আমার আগের নামটি মনে পড়েছে।"

"তোমার আগের নাম কী?

"আমার আগের নাম রিয়ানা।"

টিশা বলল, "রিয়ানা খুব সুন্দর নাম।"

মেয়েটি খাঁচাটাকে উপরে তুলতে তুলতে বলল, "আমার মাথায় যখন আবার নতুন করে সিস্টেম ডাউনলোড করবে তখন আমি রিয়ানা নামটা ভুলে যাব। এই নামটির এখন আর কোনো গুরুত্ব নেই।"

আমি আর টিশা ছোট খাঁচাটার ভেতর বসে দেখলাম প্রিমা তিন নামের দস্যু মেয়েটি জোছনার আলোতে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। মেয়েটাকে দেখে কেমন যেন দুঃখী একটা মেয়ে মনে হতে থাকে।

ছোট একটা খাঁচার ভেতরে হাত-পা ছড়িয়ে বসা যায় না, কাজেই ঘুমানোর কোনো প্রশ্নই আসে না, কিন্তু শেষ রাতের দিকে আমরা দুজনেই ঘুমিয়ে গেলাম। আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বিচিত্র দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম, খাড়া পাহাড়ের উপর দিয়ে দৌড়াচ্ছি। দুই পাশে খাড়া খাদ, একটু তাল হারালেই সেই খাদে পড়ব। কিছু বুনো পশু তাড়া করছে, আমি থামতে পারছি না। হঠাৎ একটা পশু আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং আমি পা পিছলে খাদের মাঝে পড়ে যাচ্ছি। আমি চমকে উঠে জেগে উঠলাম। দেখলাম দুজন দস্যু আমাদের খাঁচাটি নিচে নামাচ্ছে। টিশা মনে হয় এতটুকু ঘুমাতে পারেনি, চোখের নিচে কালি, চেহারায় এক ধরনের উদভ্রান্ত দিশেহারা ছাপ।

দস্যু দুজন খাঁচা খুলে আমাদের বের করে সামনের দিকে ধাক্কা দেয়। আমি পড়ে যেতে যেতে কোনোভাবে নিজেকে সামলে নিলাম। টিশা আর আমি পাশাপাশি গা ঘেঁষে হেঁটে যেতে থাকি, সামনে একটা বড় ট্রেইলার, তার দরজা খুলে আমাদের দুজনকে ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। ট্রেইলারের ভেতরে একটা টেবিলের পিছনে মায়ী মায়ী বসে আছে, টেবিলের উপর অনেকগুলো ছোট টিউব। মায়ী মায়ী একটা টিউব বেছে নিয়ে হাত দিয়ে তার মাথার পেছনে ক্রেনিয়ালে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল। সাথে সাথে তার শরীর একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠে, কয়েক মুহূর্ত সে চোখ বন্ধ করে রাখে তারপর জিব দিয়ে তৃপ্তির মতো একটা শব্দ করে আমাদের দুজনের দিকে তাকাল। আমি দেখলাম তার সবুজ চোখ দুটো আস্তে আস্তে প্রথমে হলুদ, গোলাপি হয়ে টকটকে লাল হয়ে উঠল। হঠাৎ করে তাকে মানুষ মনে না হয়ে রাক্ষুসি মনে হতে থাকে।

মায়ী মায়ী বলল, "আয়, কাছে আয়।"

আমি আর টিশা ভয়ে ভয়ে কাছে এগিয়ে গেলাম। মায়ী মায়ী হিস হিস করে বলল, "চিকি চিকি চিংড়া! তোদের মাথায় কেরেনিয়াল নাই কেন?"

টিশা বলল, "আমাদের মাথায় লাগায়নি।"

মায়ী মায়ী ধমক দিয়ে উঠল "কেন লাগায় নাই? কে লাগায় নাই?"

"আমাদের শহরে ষোল বছর হলে ক্রেনিয়াল লাগায়। আমাদের বয়স এখনো ষোল হয়নি।"

মায়ী মায়ী দাঁত কিড়মিড় করে বলল, "যার মগজে কেরেনিয়াল নাই তার সাথে একটা জানোয়ারের কোনো পার্থক্য আছে? নাই? একটা জানোয়ার কিছু জানে? কিছু বুঝে? তোরা কিছু জানিস? বুঝিস? তোরা জানোয়ার! কিরি কিরি কিরি কিরি..."

মায়ী মায়ীর শরীরে কেমন যেন খিঁচুনির মতো হতে থাকে। কিছুক্ষণ পর খিঁচুনিটা থেমে যায়, চোখের রং লাল থেকে হলুদ হয়ে আবার সবুজ হয়ে যায়। সবুজ রঙের চোখ দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর লোল টানার মতো একটা শব্দ করে বলল, "তোদের দিয়ে আমি কী করব? তোরা একটা মাংসের দলা ছাড়া আর কিছু না! তোরা জানিস দুই আর দুই যোগ করলে কত হয়?"

আমরা মাথা নাড়লাম। মায়ী মায়ী বলল, "দিন কেমন করে রাত হয় জানিস? রাত কেমন করে দিন হয় জানিস? ইলেকট্রিসিটি কেমন করে হয় জানিস? অস্ত্র কেমন করে গুলি করে জানিস? বোমা কেমন করে ফাটে জানিস? মগজের ভেতরে কী আছে জানিস? বুকের ভেতর কী আছে জানিস? কেরেনিয়াল কেমন করে কাজ করে জানিস?"

আমরা উত্তর দেবার আগেই মায়ী মায়ী টেবিলে থাবা দিয়ে বলল, "কিছু জানিস না! কিছু জানিস না। চিকি চিকি চিকি চিকি..."

প্রচণ্ড রাগে তার শরীর কাঁপতে থাকে। মায়ী মায়ী আমাদের কাছে যে বিষয়গুলো জানতে চেয়েছে আমরা তার প্রত্যেকটা জানি, বই পড়ে শিখেছি কিন্তু আমরা সেটা বলার চেষ্টা করলাম না। কারণটা ব্যাখ্যা করতে পারব না কিন্তু আমার মনে হতে থাকে এই দস্যুদলের

যদি ধারণা হয় আমরা কিছু জানি না, বুঝি না—পুরোপুরি অপদার্থ দুজন মানুষ তাহলে সেটাই আমাদের জন্য নিরাপদ।

মায়ী মায়ী হঠাৎ করে নিজের গলার কাছে কোথায় একটা চাপ দিল, তারপরে খনখনে গলায় বলল, "সিস্টিম পনের কোনখানে? মাজাভাঙা কানা লুলা সিস্টিম পনের আমার খাঁচার মাঝে আয়।"

এতক্ষণ আমাদের সাথে যে কথাগুলো বলছিল সেটা আমরা দুজন ছাড়া কেউ শোনেনি কিন্তু এই কথাগুলো সারা কনভয়ের সবাই শুনতে পেল। সিস্টেম পনের কথাটার অর্থ বুঝতে পারলাম, যাদের মাথায় সিস্টেম পনের ঢোকানো হয়েছে তাদেরকে সে ডাকছে।

কিছুক্ষণের মাঝেই তিনজন মানুষ এসে হাজির হলো। একজন পুরুষ অন্যজন মহিলা, বাকি মানুষটি পুরুষ না মহিলা বোঝা গেল না। মানুষগুলো ট্রেইলারে ঢুকে মায়ী মায়ীর পাশে এসে দাঁড়াল। মহিলা সিস্টেম পনের জিজ্ঞেস করল, "কোনো সমস্যা মায়ী মায়ী?"

মায়ী মায়ী প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মাথার পেছনে হাত দিয়ে তার ক্রেনিয়াল থেকে টিউবটা বের করে, টেবিলের উপর থেকে আরেকটা টিউব নিয়ে সেটা ক্রেনিয়ালে ঢুকিয়ে দিল। সাথে সাথে তার চোখগুলো কেমন যেন ঘোলা হয়ে যায় এবং তার সারা শরীর থর থর করে কাঁপতে থাকে। সিস্টেম পনের লোড করা মানুষগুলো মায়ী মায়ীর এই অবস্থা দেখে মোটেও বিচলিত হলো না—মনে হলো তারা এরকম দৃশ্য দেখে অভ্যস্ত। মায়ী মায়ী একটু পরেই শান্ত হয়ে চোখ খুলে তাকাল, চোখের রং এখন টকটকে লাল।

যে মানুষটিকে দেখে পুরুষ না মহিলা বোঝা যায় না, সে জিজ্ঞেস করল, "মায়ী মায়ী, কোনো সমস্যা?"

মায়ী মায়ী মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "না, কোনো সমস্যা না। সমস্যা হলে এই মায়ী মায়ী নিজেই সেটা সমাধান করতে পারে। পারে না?"

সিস্টেম পনের লোড করা তিনজন মাথা নাড়ল, বলল, "পারে। মায়ী মায়ী পারে।"

মায়ী মায়ী বলল, "আমি তোদের ডেকেছি একটা পরমার্শ করার জন্য।" মায়ী মায়ী তখন আঙুল দিয়ে আমাদের দুজনকে দেখিয়ে বলল, "এই দুইটার মাথায় কেরেনিয়াল নাই—তার মানে এরা কিছু

জানে না কিছু বুঝে না! এদের বয়স যতই হোক বুদ্ধিশুদ্ধি চার-পাঁচ বছরের বাচ্চা থেকে বেশি হবে না। হবে?"

মানুষ তিনজন মাথা নাড়ল, পুরুষটা বলল, "যদি ক্রেনিয়াল না লাগায় তাহলে কেমন করে বুদ্ধিশুদ্ধি লোড করবে?"

মায়ী মায়ী বলল, "এখন এই দুইটাকে কী করি। এদের আমার দলে থাকা মানেই তো যন্ত্রণা? আমি কী ভাবছিলাম জানিস?"

"কী মায়ী মায়ী?"

"এদের বয়স তো কম—এদের কেটে হৃৎপিণ্ড ফুসফুস কলিজা কিডনি বের করে নিই। আমার শরীরে আরেকটা হৃৎপিণ্ড থাকলে ভালো না?"

আমার বুকটা ধক করে ওঠে! কী সর্বনাশ! মায়ী মায়ীর পরামর্শটা মানুষগুলোর খুব পছন্দ হলো, তারা জোরে জোরে মাথা নাড়তে থাকে। পুরুষ মানুষটা বলল, "খুবই ভালো বুদ্ধি মায়ী মায়ী।"

মহিলাটা বলল, "একটা সমস্যা কিন্তু আছে।"

মায়ী মায়ী ধমক দিয়ে বলল, "কী সমস্যা?"

"অপারেশনের পরে তোমাকে কমপক্ষে দুইদিন শুয়ে বিশ্রাম নিতে হবে। তখন যদি সিস্টেম ষোল তোমাকে কিছু করে?"

মায়ী মায়ী চিৎকার করে বলল, "কী বললি তুই? সিস্টেম ষোল আমার সাথে বেঈমানি করবে? এত বড় সাহস?"

অন্য দুজন জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, "না না, করবে না—কিন্তু কিছু বলা যায় না। তা ছাড়া এখন কি তোমার টানা দুইদিন বিশ্রাম নেবার সময় আছে?"

মায়ী মায়ী কী একটা চিন্তা করে মাথা নেড়ে বলল, "নাই।"

তার শরীরে আবার খিঁচুনি হতে থাকে এবং খিঁচুনি শেষ না হওয়া পর্যন্ত সবাই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে।

পুরুষ কিংবা মহিলা বোঝা যায় না মানুষটি বলল, "আরো একটা সমস্যা আছে।"

"কী সমস্যা?"

"সার্জারি করার ক্যাপসুলে মনে হয় সমস্যা আছে।"

"কেন?"

"গত সপ্তাহে সার্জারি করার সময় একটা মারা গেল মনে নাই?"

অন্য দুজন তখন মাথা নাড়ল। বলল, "সার্জারি করার নতুন ক্যাপসুল না আনা পর্যন্ত সার্জারি করা ঠিক হবে না।"

মায়ী মায়ী বলল, "ঠিক আছে। কিন্তু তাহলে এই দুইটাকে কী করব?"

পুরুষটা বলল, "কেটে হৃৎপিণ্ড ফুসফুস কিডনি মগজ বের করে রেখে দিই। পরে কাজে লাগবে।"

মহিলাটা বলল, "হিমঘরে জায়গা নাই। গত যুদ্ধে কত মারা গেল মনে নাই?"

মায়ী মায়ী চোখ পাকিয়ে বলল, "তাহলে?"

যে মানুষটাকে দেখে বোঝা যায় না পুরুষ না মহিলা, সে বলল, "মেরে না ফেলে জীবন্ত রাখা ভালো। আজকাল জীবন্ত মানুষের দাম বেশি। বিজ্ঞানী লিংলি অনেক দাম দিয়ে জীবন্ত মানুষ কিনছে।"

মায়ী মায়ী বলল, "সত্যি?"

"হ্যাঁ মায়ী মায়ী। সত্যি।"

"কী করে জীবন্ত মানুষ দিয়ে?"

"জানি না। শুনেছি মাথায় বাই ক্রেনিয়াল লাগায়। বাই ক্রেনিয়াল হচ্ছে দুইটা ক্রেনিয়াল। একটা দিয়ে তথ্য দেয়, আরেকটা দিয়ে বের করে।" মানুষটা আমাদের দেখিয়ে বলল, "এই দুজনকে লিংলির কাছে বিক্রি করে দিলে লাভ বেশি।"

মায়ী মায়ী বলল, "ঠিক আছে তাহলে।"

আমি আর টিশা বুকের ভেতর থেকে একটা নিঃশ্বাস বের করে দিলাম, আপাতত প্রাণে বেঁচে গিয়েছি। কিন্তু কত দিন বেঁচে থাকব জানি না। কীভাবে বেঁচে থাকব সেটাও জানি না।

১০.

দস্যুদল আমাকে আর টিশাকে কীভাবে রাখবে সেটা নিয়ে আমাদের নানারকম চিন্তা ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের দুজনকে যেভাবে রাখা হলো সেটি আমরা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি। মায়ী মায়ী যতক্ষণ ট্রেইলারের ভেতর থাকে ততক্ষণ আমাদের গলায় শিকল বেঁধে তার টেবিলের সাথে বেঁধে রাখে। শুধু তাই না, মায়ী মায়ী মাঝে মাঝেই আমাদের দিকে তাকিয়ে জিবে চুক চুক শব্দ করতে করতে বলে, "তোদের মাথায় কেরেনিয়াল নাই! থাকলে তোদের একজনের মাথায় একটা কুকুরের সিস্টিম আরেকজনের মাথায় খেঁকশিয়ালের সিস্টিম লোড করে রাখতাম। তোরা দিনরাত খামচাখামচি কামড়াকামড়ি করতি—দেখে কত আনন্দ হতো।"

এ ধরনের একটা কথা বলা হলে উত্তরে কী বলতে হয় আমাদের জানা নেই, তাই আমরা নিঃশব্দে মায়ী মায়ীর দিকে তাকিয়ে থাকি। মায়ী মায়ী আমাদের কখনো নাম ধরে ডাকত না। একজনকে ভাইরাস আরেকজনকে ব্যাকটেরিয়া ডাকত! আমাদের কাজ ছিল তার ফুট ফরমাশ খাটা, হাতের কাছে মায়ী মায়ী একটা লম্বা দড়ি রেখেছিল, কাজকর্মে উনিশ-বিশ হলে সে সেই দড়িটাকে চাবুকের মতো করে আমাদের মারত।

ট্রেইলার থেকে বের হবার সময় মাঝে মাঝে শিকলে বাঁধা অবস্থায় আমাদের দুজনকে পোষা জন্তুর মতো টেনে টেনে নিয়ে যেত। দস্যুদল দৃশ্যটি দেখে খুবই মজা পেত, আমাদের দুজনের দিকে তারা

খাবারের টুকরো ছুড়ে দিত। আমরা সেগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে আমাদের পকেটে জমা করে রাখতাম।

মাঝে মাঝে আমাদের কোনো একটা গাড়ির এক্সেলের সাথে বেঁধে রাখত, আমরা গাড়ির ছায়ায় বসে দস্যুদলকে যেতে-আসতে দেখতাম। রাত্রে ঘুমানোর সময় আমাদের খাঁচার ভেতর ঢুকিয়ে উপরে ঝুলিয়ে রাখত। প্রথম প্রথম খুব কষ্ট হতো, আস্তে আস্তে কেমন জানি অভ্যাস হয়ে গেল।

দস্যুদল এক জায়গায় এক-দুই দিনের বেশি থাকত না, বেশির ভাগ সময়েই তারা রাস্তায় চলন্ত অবস্থায় থাকত। যখন তাদের কনভয় চলত তখনো তারা আমাদেরকে খাঁচায় বন্ধ করে রাখত। আমরা মাটি থেকে অনেক উপরে ঝুলতে ঝুলতে যেতাম, খাঁচাটা ডানে-বামে দুলত, প্রথম প্রথম সেই দুলোনিতে আমরা বমি করে একাকার করে ফেলতাম, আস্তে আস্তে অভ্যাস হয়ে গেল। শুধু অভ্যাস নয় আমরা আমাদের দীর্ঘ ভ্রমণ উপভোগ করতে শুরু করলাম। ছোট খাঁচা থেকে পা বের করে পা ঝুলিয়ে খাঁচার শিক ধরে বসে চারদিক দেখতে দেখতে যেতাম। নিচ থেকে যে জিনিসটাকে খুব কুশ্রী মনে হয়, উপর থেকে সেটাকেই কেন সুন্দর মনে হয় কে জানে।

এর মাঝে একদিন অন্য একটা দস্যুদলের সাথে যুদ্ধ হলো। দুই দলে প্রচণ্ড গোলাগুলি, সবাই গাড়ির আড়ালে থেকে যুদ্ধ করছে, শুধু আমি আর টিশা শূন্যের মাঝে একটা খাঁচায় ঝুলছি। ইচ্ছে করলেই আমাদের দুজনকে গুলি করে মেরে ফেলা দেয়া যায়। কিন্তু কোনো একটা কারণে কেউ আমাদের গুলি করল না। মনে হয় যারা গোলাগুলি করছে তাদের কাছে আমাদের দুজনকে এত অকিঞ্চিৎকর মনে হয়েছে যে আমাদেরকে লক্ষ করে একটা গুলি করাও হয়তো তাদের কাছে গুলির অপচয় বলে মনে করেছে!

মায়ী মায়ীর দস্যুদল কিছুক্ষণের মাঝেই অন্য দস্যুদলটিকে তাড়িয়ে দিল। একজন আহত হয়েছিল বলে দলের সাথে পালিয়ে যেতে পারেনি। তাকে ধরে এনে সবাই মিলে তাকে নানাভাবে পীড়ন করতে শুরু করল। মানুষটি সব রকম অত্যাচার সহ্য করে পাথরের

মতো মুখ করে বসে রইল। তখন কয়েকজন মিলে তাকে মাটিতে উপুড় করে শক্ত করে ধরে রাখল, মায়ী মায়ী এসে তার ক্রেনিয়ালে একটা টিউব ঢুকিয়ে দেয়। মানুষটা যন্ত্রণার একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার করে থর থর করে কাঁপতে থাকে। ধীরে ধীরে তার কাঁপুনি থেমে যায়, তখন সে উঠে বসে, মানুষের মতো নয়—হাত এবং পায়ে ভর দিয়ে পশুর মতো। মানুষটি কেমন যেন ভয়ে ভয়ে সবার দিকে তাকাল, তারপর আকাশের দিকে মুখ করে অবিকল একটা কুকুরের মতো করুণ স্বরে ডেকে উঠল। তার সেই কুকুরের ডাক শুনে দস্যুদলের সবাই উচ্চস্বরে হাসতে থাকে—এই বিষয়টা যে এত কৌতুকের ব্যাপার হতে পারে আমি আর টিশা একবারও বুঝতে পারিনি।

কুকুরে পাল্টে যাওয়া মানুষটা চারপায়ে ভর দিয়ে হাঁটতে থাকে, তারপর তার পায়ের ক্ষতটা কুকুরের মতো চাটতে থাকে। একজন দস্যু এসে তার গলায় একটা শিকল পরিয়ে তাকে টেনে সরিয়ে নিয়ে যায়। আমাদের দুজনকে যে কুকুরের মতো মানুষটা খুঁজে বের করেছিল সে কোথা থেকে এসেছিল সেটা আমাদের কাছে এখন পরিষ্কার হয়ে যায়।

কিছুদিন কেটে যাবার পর কীভাবে কীভাবে জানি আমাকে আর টিশাকে দস্যুদল মোটামুটি গ্রহণ করে নিল। ঠিক কারণটা কী জানি না—মনে হয় আমাদের বয়স কম, পাহাড়ের মতো বড় বড় দস্যুদের ভেতর আমাদের দুজনকে প্রায় খেলনার মতো মনে হয়। কিংবা পোষা কুকুর বিড়ালের উপর যে রকম মায়া পড়ে যায় হয়তো সেরকম আমাদের ওপর একটু মায়া হয়েছে।

দস্যুদল আমাদের গ্রহণ করতে শুরু করেছে ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম যখন দেখলাম তারা আমাদের ছোটখাটো জিনিসপত্র শেখাতে শুরু করেছে। একজন মাঝবয়সী দস্যু একদিন আমাদের গুনতে শেখাল—যদিও আমরা দুজন শুধু সাধারণভাবে নয় প্রাইম সংখ্যা ব্যবহার করে গুনতে জানি কিন্তু আমরা সেটা তাকে জানতে দিলাম না এবং খুব আগ্রহ নিয়ে শেখার ভান করলাম। দস্যুটি আমাদের শেখার

আগ্রহ দেখে খুশি হলো এবং আমাদের মাথায় ক্রেনিয়াল লাগানো হয়নি বলে খুব আফসোস করল। আরেক দিন একজন দস্যু আমাদেরকে সৌরজগতের গঠন ব্যাখ্যা করল, বৃহস্পতি গ্রহের চাঁদের সংখ্যা বলতে গিয়ে সে একটু ভুল করে ফেললেও আমরা সেটা তাকে ধরিয়ে দিলাম না এবং পুরো ব্যাপারটা আগ্রহ নিয়ে শোনার ভান করলাম।

শুধু যে সাধারণ দস্যুরা আমাদের গ্রহণ করল তা নয়, মনে হলো খুব ধীরে ধীর মায়ী মায়ীও আমাদেরকে খানিকটা গ্রহণ করল। আগে কখনোই আমাদের দুজনকে একা তার ট্রেইলারে রেখে যেত না, কিন্তু এখন সে মাঝে মাঝে আমাদের গলায় শেকল দিয়ে টেবিলের সাথে বেঁধে রেখে বাইরে যেতে শুরু করল। তখন একদিন আমরা একটা ভয়ংকর সাহসের কাজ করে ফেললাম।

মায়ী মায়ীর ট্রেইলারে দেয়ালে একটা ছোট বাক্সে সে ক্রেনিয়ালে ঢোকানোর টিউবগুলো রাখে। যখন দরকার হয় সে বাক্সটা খুলে সেখান থেকে এই ক্রেনি-টিউবগুলো বের করে। বাক্সটা খোলার জন্য তার চোখের রেটিনা স্ক্যান করাতে হয়। মাঝে মাঝে যখন স্ক্যানারটা প্রথমবারে কাজ করে না তখন সে আলসেমি করে চোখের রেটিনা স্ক্যান না করিয়ে সরাসরি পাসওয়ার্ড ঢুকিয়ে বাক্সটা খুলে ফেলে। যখন সে পাসওয়ার্ডটি ঢোকায় তখন আমি আর টিশা না দেখার কিংবা না বোঝার ভান করে তার আঙুলের ওঠানামা দেখে পাসওয়ার্ডটি অনুমান করার চেষ্টা করেছি। রেটিনা স্ক্যান করাটি যেন ঠিক করে কাজ না করে আর তাকে যেন বারবার সরাসরি পাসওয়ার্ডটিই ঢোকাতে হয় সে জন্যে আমরা মাঝে মাঝেই রেটিনা স্ক্যানারটি একটু ময়লা করে রাখি। বেশ কয়েকবার মায়ী মায়ীর পাসওয়ার্ড ঢোকানো দেখে আমরা শেষ পর্যন্ত পাসওয়ার্ডটি জেনে গেছি।

একদিন যখন মায়ী মায়ী আমাদের দুজনকে তার টেবিলের সাথে বেঁধে রেখে বাইরে গেল তখন আমি আর টিশা মিলে তার ক্রেনিয়াল টিউবের বাক্সে পাসওয়ার্ড ঢুকিয়ে বাক্সটা খুলে ফেললাম। টিশা

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল, আর আমি দ্রুত ক্রেনিয়াল টিউবের বাক্সটার ভেতরে দেখে নিলাম। ক্রেনি-টিউবগুলো সারি সারি সাজানো আছে, যেদিকটা ক্রেনিয়ালে ঢোকাতে হয় সেদিকে ইলেকট্রিক সংযোগের জন্য ছোট ইন্টারফেস, উল্টো পাশে আলো জ্বলার জন্য ছোট ছোট রঙিন লেজার মডিউল। ছোট টিউবগুলোর উপর ছোট ছোট সংখ্যায় ক্রেনিয়ালের কোড লেখা।

আমি ভেতর থেকে একটা ক্রেনি-টিউব বের করে বাক্সটা আবার বন্ধ করে দিলাম। টিউবটা নিজের কাছে না রেখে ট্রেইলারের এক কোনায় ফেলে রেখে দিলাম। মায়ী মায়ী যদি তার বাক্স খুলে বুঝতে পারে একটা টিউব নেই এবং সেটা নিয়ে হইচই করে তখন খোঁজার ভান করে ট্রেইলারের কোনা থেকে এটা বের করে দেওয়া যাবে। মায়ী মায়ী মনে করবে টিউবগুলো নাড়াচাড়া করার সময় তার অজান্তে একটা নিচে পড়ে গেছে।

পরের কয়েক দিন আমরা খুব ভয়ে ভয়ে থাকলাম। মায়ী মায়ী বাক্স খুলে কয়েকবার ক্রেনিয়াল টিউব বের করে ব্যবহার করল, সে বুঝতে পারল না যে আমরা একটা সরিয়ে রেখেছি। তখন একদিন আমরা পকেটে করে টিউবটা নিয়ে বের হয়ে গেলাম। রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে গেছে তখন খাঁচার ভিতরে আমি আর টিশা মিলে ক্রেনি-টিউবটা খুলে ভেতরে কী আছে সেটা দেখার চেষ্টা করলাম। এত ছোট একটা টিউব, কোনো রকম টুল ব্যবহার না করে একেবারে খালি হাতে সেটা খুলতে পারব মনে করিনি কিন্তু এটাকে নানাভাবে টানাটানি করতে করতে হঠাৎ টিউবটা খুলে এল। আমাদের কাছে যেটুকু আলো আছে সেটাতে দেখলাম ক্রেনি-টিউবটার মাঝখানে ছোট একটা আইসি, সেখান থেকে মাত্র তিনটা তার বের হয়ে ভেতরে কানেকশন দেওয়া হয়েছে। দুটো নিশ্চিতভাবে একটা নিউক্লিয়ার ব্যাটারিতে গিয়েছে, তৃতীয়টা ক্রেনিয়ালের মাথায়। ছোট একটা স্ক্রু ড্রাইভার দিয়েই আইসিটাকে খুলে আলাদা করে ফেলা যাবে।

আমি টিশার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বললাম, "টিশা।"

"বলো।"

"আমরা এখন ইচ্ছে করলে পুরো দস্যুদলকে লন্ডভন্ড করে দিতে পারব।"

টিশা ভুরু কুঁচকে তাকাল, জিজ্ঞেস করল, "কীভাবে?"

"আমরা মায়ী মায়ীর বাক্স থেকে ক্রেনি-টিউবগুলো বের করে যদি ভেতরের আইসিগুলো খুলে ওলটপালট করে দিই তাহলে কী হবে বুঝতে পারছ?"

টিশার মুখটা হাঁ হয়ে গেল, বলল, "যখন মনে করবে সিস্টেম সতের লোড করছে তখন আসলে হয়তো কুকুরের সিস্টেম লোড হয়ে যাবে। তখন ঘেউ ঘেউ করে ছুটে বেড়াবে!"

দৃশ্যটা কল্পনা করে আমি খুক খুক করে হেসে ফেললাম। বললাম "হ্যাঁ, ওরা কিছু বুঝতেই পারবে না, দুর্ধর্ষ দস্যুদল হয়তো মিনি বিড়াল হয়ে যাবে। এটা করার জন্য দরকার শুধু ছোট একটা স্ক্রু ড্রাইভার! না পেলেও ক্ষতি নেই। এক টুকরো ছোট ধাতব পিনকে ঘষে ঘষে বানিয়ে ফেলতে পারব!"

টিশা বলল, "শুধু একটা সমস্যা।"

"কী সমস্যা?"

"কোন ক্রেনি-টিউব কোন কাজ করে আমরা জানি না। আইসি ওলটপালট করার সময় যদি ভুলভাবে ওলটপালট হয়ে যায় তাহলে দস্যুদল হয়তো জল্লাদের দল হয়ে যাবে! রাক্ষস হয়ে যাবে।"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "হ্যাঁ, আমাদের মাথায় ক্রেনিয়াল থাকলে আমরা নিজেরাই পরীক্ষা করে বের করে ফেলতে পারতাম!"

আমি ক্রেনি-টিউবটা হাতে নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম, উপরে কিছু অক্ষর এবং কিছু সংখ্যা লেখা কিন্তু সেই অক্ষর কিংবা সংখ্যার অর্থ কী আমরা জানি না।

টিশা ভুরু কুঁচকে চিন্তা করতে করতে বলল, "কিছু একটা বুদ্ধি বের করে ফেলব।"

আমরা অবশ্যি অনেক চিন্তা করেও কোনো বুদ্ধি বের করতে পারলাম না, তখন একদিন আমরা আবার খুব সাহসের একটা কাজ করে ফেললাম। শুধু সাহসের না, খুবই বিপজ্জনক একটা কাজ।

আমাকে আর টিশাকে দুপুরবেলা একটা বড় লরির এক্সেলের সাথে বেঁধে এক ড্রাম ঝাঁঝালো গন্ধের সলভেন্ট দিয়ে গেছে। আমরা হাতে গ্লভস পরে সেই সলভেন্ট দিয়ে ইঞ্জিন পরিষ্কার করছি। মাঝে মাঝে কঠোর চেহারার একটা দস্যু এসে দেখে যাচ্ছে আমরা ঠিকভাবে কাজ করে যাচ্ছি কি না।

হঠাৎ একটা নারী কণ্ঠের কথা শুনলাম, কেউ একজন বলল, "কাজ কেমন চলছে?"

আমরা মাথা ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখি রিয়ানা নামের মেয়েটি, যে এখন আর রিয়ানা নয়, যার নাম এখন দ্রিমা তিন। শীতের রাতে টিশার গান শুনে যে আমাদের খাঁচার নিচে থমকে দাঁড়িয়েছিল।

আমি মুখে হাসি ফুটিয়ে বললাম, "কাজ খুব ভালো চলছে।"

টিশা বলল, "ইঞ্জিনটা প্রায় চকচকে করে ফেলেছি।"

রিয়ানা কিংবা দ্রিমা তিন বলল, "তোমাদের এখানে আনন্দের কিছু নেই।"

আমরা চুপ করে রইলাম কারণ কথাটি সত্যি।

রিয়ানা বলল, "যদি তোমাদের মাথায় ক্রেনিয়াল থাকত তাহলে তোমাদের মাথায় বেসিক একটা ক্রেনি-টিউব দিয়ে একটু আনন্দ দেওয়া যেত।"

আমরা এবারও চুপ করে রইলাম, কারণ আমাদের মাথায় ক্রেনিয়াল নেই, বাইরে থেকে আমাদের মাথায় আনন্দ দেবার কোনো উপায় নেই। এই দস্যুদল যখন কোনো কাজ করে না তখন তাদের ক্রেনিয়ালে আনন্দ পাবার নানা ধরনের টিউব লাগিয়ে সময় উপভোগ করে। মানুষগুলোকে দেখলে তখন কেমন জানি অস্বস্তি হয়। প্রচণ্ড আনন্দে তাদের চোখ বন্ধ হয়ে যায়, শরীর কাঁপতে থাকে, মুখ দিয়ে লোল ঝরতে থাকে—এই তীব্র আনন্দটি আমরা কোনো দিন অনুভব করতে পারব না। হয়তো কোনো মাদক খেয়ে এরকম আনন্দ পাওয়া সম্ভব।

রিয়ানা বলল, "তোমরা কাজ করো, আমি যাই।"

তখন হঠাৎ করে টিশা তাকে জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের সবার কাছে কি আনন্দ পাবার ক্রেনি-টিউব থাকে?"

"বেসিক টিউবটি সবার আছে। যার সিস্টেম যত বেশি সে তত তীব্র আনন্দের ক্রেনি-টিউব ব্যবহার করতে পারে।"

টিশা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কি একটা ক্রেনি-টিউব দেখে বলতে পার এটা কিসের টিউব?"

"না। আমরা পারি না। টিউবের উপর কোড লেখা থাকে, যাদের সিস্টেম তের থেকে বেশি তারা কোড ভেদ করতে পারে।"

টিশা বলল, "ও।"

আমি তখন খুব সাহস এবং মনে হয় ভয়ংকর ঝুঁকিপূর্ণ কাজটি করে ফেললাম, বললাম, "তোমাকে কি আমরা একটা কথা বলতে পারি?"

"কী কথা?"

"আমাদেরকে মায়ী মায়ী যখন তার ট্রেইলারে বেঁধে রেখেছে তখন মেঝেতে আমরা একটা ক্রেনি-টিউব খুঁজে পেয়েছিলাম।"

রিয়ানার চোখ দুটো একটু বিস্ফারিত হয়ে গেল, এদিক-সেদিক তাকিয়ে বলল, "তুমি কী বললে?"

কথা যখন শুরু করে দিয়েছি, সেটা শেষ করে ফেলতে হবে, এখন আর পেছানোর উপায় নেই। আমি প্রায় মরিয়া হয়ে বলেই ফেললাম, "তুমি কি এই ক্রেনি-টিউবটি তোমার মাথায় লাগিয়ে বলতে পারবে এটা কিসের টিউব?"

রিয়ানা কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা বলল না, তারপর ফিসফিস করে বলল, "তুমি যে কথাটা বলেছ সেটা এই দস্যুদলের আর কেউ যেন না শোনে, তাহলে তোমাদের খুব বড় বিপদ হবে। আর এই টিউবটা মায়ী মায়ীকে ফিরিয়ে দিয়ো। তোমরা সিস্টেম সতেরর ক্ষমতা জান না!"

আমি কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলাম। রিয়ানা কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে হেঁটে চলে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে

পড়ল, ফিরে এসে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, "দাও ক্রেনি-টিউবটি।"

আমি কাঁপা হাতে রিয়ানার হাতে টিউবটি দিলাম। সে মুঠি বন্ধ করে হাতটি পকেটে ঢুকিয়ে চলে গেল।

পরের দুটি দিন রিয়ানা কী করে সেটা নিয়ে খুব ভয়ে ভয়ে থাকলাম। সে যদি মায়ী মায়ীর কাছে আমাদের নিয়ে নালিশ করে দেয় তাহলে আমাদের কী অবস্থা হবে আমরা সেটা চিন্তাও করতে পারি না। রিয়ানা অবশ্যি নালিশ করল না। তৃতীয় দিন তার সাথে আবার আমাদের দেখা হলো। আমি আর টিশা তখন একটা বড় লরির টায়ারের ফাঁকে আটকে থাকা পাথরের টুকরোগুলো পরিষ্কার করছিলাম। রিয়ানা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ আমাদের কাজ করতে দেখল, যখন আশেপাশে কেউ নেই, তখন পকেট থেকে ক্রেনি-টিউবটা বের করে আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "নাও।"

আমি সেটা হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি পকেটে ঢুকিয়ে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলাম, "এটা কিসের টিউব?"

"সিস্টেম পনের।"

"তার মানে কী?"

"তার মানে এটা খুবই মূল্যবান। মায়ী মায়ী সিস্টেম সতের। এখানে সিস্টেম পনের মাত্র চারজন।"

রিয়ানা কেমন বিচিত্র দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল।

আমি বললাম, "ক্রেনিয়াল টিউব আমাদের কোনো কাজে লাগে না। তুমি এটা রেখে দিতে চাও? তুমিও সিস্টেম পনের হয়ে যাবে?"

রিয়ানা মাথা নাড়ল, বলল, "না। আমি সিস্টেম পনের হতে চাই না। আমি যা তাই থাকতে চাই। সম্ভব হলে আমি একটা নিউট্রাল টিউব আমার মাথায় লাগিয়ে স্বাভাবিক মানুষ হতে চাই।"

দুইদিন পরে আমরা আবার যখন একটা লরির ইঞ্জিন পরিষ্কার করছি তখন আবার রিয়ানার সাথে দেখা হলো। আমি এদিক-সেদিক

তাকিয়ে আমার পকেট থেকে দুটি ক্রেনি-টিউব বের করে মুঠি বন্ধ করে তার দিকে হাতটা এগিয়ে দিলাম। ধীরে ধীরে আমাদের সাহস বেড়েছে, মায়ী মায়ী যখন আবার আমাদেরকে ট্রেইলারের ভেতর রেখে বাইরে গেছে, আমরা এবারে তার বাক্স থেকে দুটি ক্রেনি-টিউব সরিয়ে এনেছি।

রিয়ানা জিজ্ঞেস করল, "তোমার হাতে কী?"

আমি মুঠি খুলে তাকে ক্রেনি-টিউব দুটি দেখালাম। রিয়ানা একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল, কেমন করে আমার হাতে দুটি ক্রেনি-টিউব এসেছে সেটা নিয়ে প্রশ্ন করল না। একটা টিউব হাতে নিয়ে তার গায়ে লেখা কোডটা পড়ে আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, "এটা নিচু স্তরের শারীরিক আনন্দ পাবার টিউব।" তারপর দ্বিতীয়টা হাতে নিয়ে তার কোডটা পড়ে আমার হাতে ফেরত দিয়ে বলল, "এটা সিস্টেম সাত।"

টিশা জিজ্ঞেস করল, "তুমি মাথায় না লাগিয়েই কেমন করে বলে দিচ্ছ?"

"আমি কোড পড়েই বলে দিতে পারি। আমি কোডটা জানি।"

"কেমন করে জানলে?"

"যখন আমার ক্রেনিয়ালে সিস্টেম পনের লাগিয়েছিলাম তখন জেনেছি।" রিয়ানা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "তোমরা যদি লেখাপড়া জানতে তাহলে আমি তোমাদের কোডটা শিখিয়ে দিতে পারতাম।"

টিশা এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, "আমরা লেখাপড়া জানি।"

রিয়ানা কোনো কথা না বলে কিছুক্ষণ আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, "তোমরা যদি আমাকে একটা নিউট্রাল ক্রেনি-টিউব এনে দিতে পার তাহলে আমি তোমাদের কোডটা শিখিয়ে দিতে পারি।"

টিশা ফিক করে হেসে ফেলল, বলল, "তুমি যদি আমাদের কোডটা শিখিয়ে দাও তাহলে আমরা তোমাকে একটা নিউট্রাল ক্রেনি-টিউব এনে দিতে পারি!"

রিয়ানা বলল, "ঠিক আছে। আমি তোমাদের কোডটা শিখিয়ে দেব।"

রিয়ানা আমাদের কোডটা শিখিয়ে দেওয়ার দুদিন পর আমরা তাকে একটা নিউট্রাল ক্রেনি-টিউব খুঁজে এনে দিলাম। টিউবটা হাতে নিয়ে সে কিছুক্ষণ চুপচাপ আমাদের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তোমাদের অনেক ধন্যবাদ। আমি এখন আবার সত্যিকারের মানুষে হয়ে বেঁচে থাকতে পারব।"

ক্রেনি-টিউবের কোডটি জানার পর হঠাৎ করে আমার আর টিশার ক্ষমতা প্রায় আকাশ ছুঁয়ে ফেলল। আমরা এখন ক্রেনি-টিউবের ভেতরের আইসিগুলো ওলটপালট করে দেব। দস্যুদল ভয়ংকর দস্যু হওয়ার জন্য মাথার মাঝে একটা ক্রেনি-টিউব লাগিয়ে নিজের অজান্তেই নিরীহ দুর্বল একজন মানুষে পাল্টে যাবে!

আমি আর টিশা খুব সাবধানে কাজ করতে শুরু করলাম, কিন্তু কোনো কিছু করার আগেই হঠাৎ করে একদিন আবিষ্কার করলাম মায়ী মায়ী আমাদের দুজনকে বিজ্ঞানী লিংলির কাছে বিক্রি করে দিয়েছে।

মায়ী মায়ীর ট্রেইলারের বাক্স থেকে এগারটা ক্রেনি-টিউব সরিয়ে নেওয়া ছাড়া আমরা আর কিছুই করতে পারলাম না।

তৃতীয় পর্ব

১১.

বিজ্ঞানী লিংলির শহরে এসে অনেক দিন পর আমি আর টিশা আবার স্বাধীন মানুষ হয়ে থাকার আনন্দটা উপভোগ করতে লাগলাম। গলা থেকে শিকল ঝুলছে না, কেউ সেই শিকল ধরে রাখছে না, কিছু একটা উনিশ-বিশ হতেই কেউ কুৎসিত একটা গালি দিয়ে পেছন থেকে একটা দড়ি দিয়ে মারছে না। তার চাইতে বড় কথা দস্যুদলের মাঝে যে সারাক্ষণ একটা অপমান সহ্য করতে হয়েছে সেই অপমানটুকু নেই, অন্য সবার মতো মানুষের একটা সম্মান নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারছি, বিষয়টি বিশ্বাস করতেই আমাদের প্রথম প্রথম কষ্ট হতো।

আমাদেরকে একটা বড় হোস্টেলে রাখা হয়েছে। নিজেদের জন্য আলাদা ছোট ছোট ঘর, নিচে খাবার জায়গা। পুরো হোস্টেলে অনেকে থাকে, কে কী করে, কেন এখানে থাকে সেটি পরিষ্কার নয়। আমাদের দুজনকে বলে দেওয়া হয়েছে আমরা যেন নিজেদের সম্পর্কে একটা কথাও না বলি—সে রকম অন্য সবাইকেই নিশ্চয়ই একই কথা বলা হয়েছে, তাই কেউ কারো সাথে ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কথা বলে না। প্রতিদিন ভোরে নিজেদের ব্যবহারের জন্য আমাদের জন্য তৈরি করা আইডি কার্ডে কিছু ইউনিট ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। আমরা যখন শহরে ঘুরে বেড়াই তখন নিজেদের ছোটখাটো প্রয়োজনে ইউনিটগুলো খরচ করতে পারি। আমাদের আইডি কার্ডগুলো নিরীহ আইডি কার্ড নয়, এটি প্রতি মুহূর্তে নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও আমাদের সম্পর্কে তথ্য পাঠাতে থাকে, আমরা মুক্ত মানুষের মতো সারা শহরে ঘুরে বেড়ালেও সারাক্ষণ যে আমাদের উপর নজর রাখা হচ্ছে আমরা সেটি টের পাই।

এটাও এক ধরনের শেকল, মায়ী মায়ীর শেকলের মতো অশালীন শেকল নয়, খুব সূক্ষ্ম এক ধরনের অদৃশ্য শেকল।

বিজ্ঞানী লিংলির শহরটি খুব সুন্দর। আমাদের শহরের মতো খাপছাড়া নয়, আমাদের শহরের মতো ছোট নয়, এটা অনেক বড়। আমরা ইচ্ছে করলেই আমাদের পুরো শহরটা একদিনে ঘুরে আসতে পারতাম, এই শহরটার এক মাথা থেকে অন্য মাথা দিনে দিনে ঘুরে আসা সম্ভব নয়। শহরের মাঝখান দিয়ে ট্রাম লাইন আছে, জায়গায় জায়গায় পার্ক, পার্কে ফুলের বাগান এবং বসার জায়গা। শহরের এক পাশ দিয়ে অপূর্ব একটা খাল, খালের দুই পাশে ছায়াঢাকা বড় বড় গাছ, সেখানে বসার জন্য একটু পরপর কাঠের বেঞ্চ। বিকেল বেলা তরুণ-তরুণীরা রঙিন পোশাক পরে সেখানে ভিড় করে আসে।

দিনের বেলা মানুষজন শহরে ঘুরে বেড়ায়। যারা বয়স্ক তাদের সবার মাথার মাঝে ক্রেনিয়াল, তাদের চোখে-মুখে এক ধরনের প্রশান্তির চিহ্ন। তাদের চলাফেরায় কোনো ব্যস্ততা নেই। কমবয়সী তরুণ-তরুণীরা যাদের মাথায় এখনো ক্রেনিয়াল লাগানো হয়নি তাদের চেহারায় মাঝে মাঝে অস্থিরতার ছাপ দেখা যায়। মাঝে মাঝেই দেখা যায় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে অকারণে হি হি করে হাসছে কিংবা উচ্চ স্বরে কোনো কিছু নিয়ে তর্ক করছে। শক্ত সমর্থ দুজন তরুণকে একদিন ঘুষোঘুষিও করতে দেখেছি। মাথায় ক্রেনিয়াল লাগানোর পর সবাই শান্ত হয়ে যাবে, সবাই সভ্য ভব্য কাজের মানুষ হয়ে যাবে।

আমি আর টিশা শহরটি ঘুরে ঘুরে দেখতে গিয়ে একদিন লিংলির ল্যাবরেটরিটা আবিষ্কার করে ফেললাম। শহরের এক পাশে বিরাট এলাকা নিয়ে ল্যাবরেটরি কমপ্লেক্স, উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা হলেও বড় বিল্ডিংগুলো বাইরে থেকে দেখা যায়। প্রতিদিন ভোরে দলে দলে মানুষ সাদা অ্যাপ্রোন পরে ল্যাবরেটরিতে ঢোকে—দুপুর বেলা একদল বের হয়ে অন্য এক দল ঢোকে, বিকেলেও একই অবস্থা। ল্যাবরেটরি কখনো বিশ্রাম নেয় না—গভীর রাতেও সেখানে অনেক মানুষ থাকে।

ল্যাবরেটরির কমপ্লেক্সের একটি মাত্র গেট, সেই গেট দিয়ে সব মানুষকে ঢুকতে হয় আবার বের হতে হয়। তাদের গলায় ঝোলানো ব্যাজ থাকে, চোখের রেটিনা স্ক্যান করে ব্যাজের সাথে মিলিয়ে সবাইকে ভেতরে ঢোকানো হয়। সবকিছু স্বয়ংক্রিয়, কোনো মানুষের প্রয়োজন নেই, তারপরও কয়েকজন বড় মানুষ হাতে ভয়ংকর অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে সবাইকে তীক্ষ্ণ চোখে পরীক্ষা করে। আমরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে বিষয়টা দেখছিলাম, তখন পাহাড়ের মতো একজন আমাদের ধমক দিয়ে বলল, "এখানে দাঁড়িয়ে কী দেখছ? ভাগো এখান থেকে।"

আমি আর টিশা সাথে সাথে সরে এসেছি।

সপ্তাহ দুয়েক পর ভোরবেলা নাশতা করে আমি আর টিশা যখন হোস্টেল থেকে বের হচ্ছি, তখন হোস্টেলের গেটে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলাটি আমাদের থামাল, বলল, "কোথায় যাও?"

এর আগে আমাদের কখনো কেউ থামায়নি। তাই আমরা একটু অবাক হলাম, ইতস্তত করে বললাম, "এই তো, বাইরে, একটু শহরটা ঘুরে দেখছি।"

"যেখানেই যাও সন্ধের আগে ফিরে আসবে।"

আমরা মাথা নাড়লাম, বললাম, "ফিরে আসব।"

টিশা জিজ্ঞেস করল, "কেন? আজকে কী হবে?"

"আমি জানি না। কিন্তু তোমাদের ফিরে আসতে হবে। আইডি কার্ডে সব দেখতে পাবে।"

আজকে আমাদের শহরের লাইব্রেরিটি খুঁজে বের করার কথা। বেশ আগ্রহ নিয়ে দুজনেই সেটা খুঁজে বের করার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। মহিলাটির কথা শুনে আমাদের উৎসাহে একটু টান পড়ল, তারপরেও দুজনে বের হয়ে গেলাম।

খুঁজে খুঁজে শহরের শেষ প্রান্তে আমরা লাইব্রেরিটা আবিষ্কার করলাম, বেশ বড় আলোঝলমল একটা দালান। ভেতরে লোকজন যাচ্ছে এবং বের হচ্ছে, আমরা দুজনও ভেতরে ঢুকে গেলাম। গেটে

আইডি কার্ডটা স্পর্শ করতেই একটা কর্কশ শব্দ হলো এবং কোথা থেকে জানি একজন বয়স্ক মানুষ বের হয়ে এল। আমাদের দিকে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোমার কী চাও?"

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, "লাইব্রেরিতে যাব।"

মানুষটি শব্দ করে হেসে উঠল, বলল, "তোমরা লাইব্রেরিতে গিয়ে কী করবে? তোমাদের মাথায় ক্রেনিয়াল কোথায়?"

টিশা বলল, "ক্রেনিয়াল না থাকলে লাইব্রেরি যাওয়া যায় না?"

"না।"

"ও!" টিশা বলল, "আমরা ভেবেছিলাম ভিডি টিউবে ক্রিস্টাল দিয়ে বই পড়া যায়।"

টিশার কথা শুনে মানুষটি আবার হাসতে থাকে, মনে হলো রীতিমতো কষ্ট করে হাসি থামিয়ে বলল, "ভিডি টিউব আর ক্রিস্টাল দেখতে হলে তোমাদের মিউজিয়ামে যেতে হবে! তোমরা কারা? মনে হয় অন্য জগৎ থেকে এসেছ!"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "ঠিকই বলেছ! আমরা মোটামুটি অন্য জগৎ থেকে এসেছি।"

আমরা বের হয়ে আসার আগে ভেতরে একবার উঁকি দিলাম। ছোট ছোট অসংখ্য খুপরি। প্রত্যেকটা খুপরিতে একটা করে মানুষ। দেয়াল থেকে একটা তার এসে তাদের ক্রেনিয়ালে ঢুকে গেছে। দস্যুদলে আমরা যে রকম ক্রেনিয়াল টিউব দেখেছিলাম এটা সে রকম নয়। কোনো এক ধরনের ক্যাবল দিয়ে সরাসরি ক্রেনিয়ালে তথ্য ঢোকানো হচ্ছে। মানুষগুলো চোখ বন্ধ করে নিঃশব্দে বসে আছে।

আমরা সন্ধে হওয়ার অনেক আগেই আমাদের হোস্টেলে অপেক্ষা করতে থাকি। ভেতরে এক ধরনের চাপা দুশ্চিন্তা কাজ করছিল, বিজ্ঞানী লিংলি কী মূল্য দিয়ে মায়ী মায়ীর কাছ থেকে আমাদের কিনেছে আমরা জানি না, কেন কিনেছে তাও জানি না। ভাসাভাসা ভাবে মায়ী মায়ীর কাছে যেটা শুনেছিলাম সেটাও ভালো কিছু নয়—তবে তার কথা কতটুকু বিশ্বাস করা যায় কে জানে।

সন্ধের একটু আগে একজন মানুষ এসে আমাদের দুজনকে হোস্টেল থেকে বাইরে এনে একটা গাড়িতে বসাল। গাড়ির ভেতরে আবছা অন্ধকার, চোখটা একটু সয়ে এলে দেখলাম, সেখানে সেজেগুঁজে থাকা একজন মহিলা আগে থেকে বসে আছে। আমাদের দিকে তাকিয়ে একধরনের মাপা হাসি দিয়ে বলল, "তোমরা রিহি এবং টিশা?"

আমরা দুজন মাথা নাড়ালাম।

"দুর্ধর্ষ দস্যুদল মায়ী মায়ীর হাতে বন্দি ছিলে?"

আমরা আবার মাথা নাড়লাম।

"বন্দি জীবন থেকে মুক্ত হয়েছ সে জন্য অভিনন্দন।"

আমরা নিচু গলায় বললাম, "ধন্যবাদ।"

মহিলাটি তখন চুপ করে গেল এবং জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?"

"কমিউনের মিটিংয়ে।"

আমরা দুজনেই খুব অবাক হলাম। আমি আর টিশা কেউই এই শহরের মানুষ নই। এই শহরের কমিউনিটি মিটিংয়ে আমাদের দুজনের কারোরই কোনো কিছু জানার নেই, কোনো কিছু বলারও নেই। তাহলে আমাদের সেখানে কেন নেয়া হচ্ছে?

গাড়িটি আমাদের শহরের মাঝামাঝি নিয়ে গেল, সেখানে একটা বিশাল হলঘরে আমাদের দুজনকে নিয়ে মহিলাটি ঢুকে গেল। মিটিং শুরু হতে এখনো দেরি আছে, চেয়ারগুলো বেশির ভাগই ফাঁকা। মহিলাটি আমাদের দুজনকে নিয়ে মাঝামাঝি এক জায়গায় বসিয়ে নিচু গলায় বলল, "তোমরা দুজন নিজে থেকে কারো সাথে একটি কথা বলবে না। ঠিক আছে?"

আমি আর টিশা মাথা নাড়লাম, নিজে থেকে কোনো কথা বলা যাবে না কিন্তু অন্যেরা চাইলে কি কথা বলা যাবে? আমরা অবশ্য ব্যাপারটার আর কোনো ব্যাখ্যা চাইলাম না।

ধীরে ধীরে হলঘরটা ভর্তি হতে লাগল। যারা আসছে তাদের বেশির ভাগই একটু বয়স্ক মানুষ, আমার আর টিশার বয়সী মানুষ খুব

কম। পুরুষ এবং মহিলার সংখ্যা প্রায় সমান সমান। সামনে স্টেজে একজন মানুষ সবাইকে ব্যস্ত রাখার জন্য একটা পিয়ানো বাজাতে লাগল, খুবই একঘেয়ে সুর কিন্তু প্রত্যেকটার একটা অংশ শেষ করার সাথে সাথে সবাই এমনভাবে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে লাগল যে আমার সন্দেহ হতে লাগল ক্রেনিয়ালে করে এদের মাথায় এই পিয়ানো সংগীতের জন্য আলাদাভাবে ভালোবাসা তৈরি করে রাখা আছে।

একসময় পিয়ানো বন্ধ হয়ে গেল এবং মঞ্চে এই শহরের কমান্ড্যান্ট এসে ঢুকল। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে হাততালি দিতে থাকে। কমান্ড্যান্ট মানুষটি মাঝবয়সী এবং দেখতে প্রায় আমাদের শহরের কমান্ড্যান্টের মতো, মানুষটি যখন মাইক্রোফোনে কথা বলতে থাকে, তখন আবিষ্কার করলাম তার কথা বলার ধরনটুকুও হুবহু আমাদের শহরের কমান্ড্যান্টের মতো। কমান্ড্যান্ট বলতে শুরু করল, "আমার প্রিয় শহরবাসী, কমিউনের সভায় তোমাদের আমন্ত্রণ।"

কমান্ড্যান্ট একটু থামল এবং সবাই জোরে জোরে হাততালি দিতে লাগল। আমাদের কমান্ড্যান্টের মতো এই কমান্ড্যান্টের কথার মাঝখানেও একটু পরে পরে হাততালি দিতে হয়।

কমান্ড্যান্ট বলল, "আজকে আমাদের খুব আনন্দের দিন। আজকে প্রথমবার আমাদের প্রিয় শহরের নিয়ন্ত্রণের পুরোটুকু করা হচ্ছে আমাদের নিজস্ব যান্ত্রিক ক্রেনিপিউটারে।"

সব মানুষ এবারে আরো জোরে হাততালি দিতে শুরু করে। আমি পাশে বসা সেজেগুঁজে থাকা মহিলাকে জিজ্ঞেস করলাম, "ক্রেনিপিউটারটা কোথায়?"

মহিলাটি বলল, "বিজ্ঞানী লিংলির ল্যাবরেটরিতে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এটা কী দেখতে যাওয়া যাবে?"

মহিলাটি বিরক্ত হয়ে বলল, "এখন আমার সাথে কথা না বলে কমান্ড্যান্ট কী বলছে সেটা শোনো।"

কমান্ড্যান্ট বলল, "এই ক্রেনিপিউটার আমাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া সভ্যতাকে আবার নতুন করে দাঁড়া করাবে। একবিংশ

শতাব্দীতে কম্পিউটার যে ভূমিকা রেখেছিল এই শতাব্দীতে ক্রেনিপিউটার সেই একই ভূমিকা রাখবে। পৃথিবীর সব প্রযুক্তি হয় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল না হয় ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছিল। এই সময়ে মহাবিজ্ঞানী লিংলি একেবারে নিজস্ব প্রযুক্তি ব্যবহার করে দাঁড়া করিয়েছে এই নতুন যুগের ক্রেনিপিউটার।"

হলঘরের সব মানুষ রীতিমতো চিৎকার করে হাততালি দিতে থাকে। কমান্ডেন্ট হাততালি থেমে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তারপর বলল, "আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার এই মহাবিজ্ঞানী লিংলি আমাদের শহরের একজন মানুষ। আমাদের এই শহরে বসে গবেষণা করে সে এই ক্রেনিপিউটার গড়ে তুলেছে। সেই ক্রেনিপিউটার এখন এই শহরকে নিয়ন্ত্রণ করছে। নেটওয়ার্কের সাহায্যে সেটা ইতোমধ্যে আশেপাশের শহরের সাথে যোগাযোগ করছে। একসময় সেই শহরগুলোকেও নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করবে। এভাবে ধীরে ধীরে একসময় নিশ্চয়ই সারা পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করবে।"

এই শহরের একটা ক্রেনিপিউটার সারা পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করবে শুনে হলঘরের মানুষেরা রীতিমত উত্তেজিত হয়ে হাততালি দিতে শুরু করে। কমান্ডেন্ট হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে আবার কথা বলতে শুরু করে, বাঁধাধরা কথা। এরকম কথা আমরা আমাদের শহরে আমাদের কমান্ড্যান্টের মুখে অনেকবার শুনেছি। কথা শুনতে শুনতে আমি অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম।

কতক্ষণ কমান্ড্যান্ট কথা বলেছে আমি জানি না। হঠাৎ করে হলঘরের সব মানুষ একেবারে পাগলের মতো চিৎকার করে হাততালি দিতে দিতে দাঁড়িয়ে গেল। কমান্ড্যান্টের ঠিক কোন কথাটি শুনে হলঘরের সব মানুষ এ রকম উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে আমি লক্ষ করিনি। নিচু হয়ে টিশাকে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে টিশা? কমান্ডেন্ট কী বলেছে?"

"বলেছে, বিজ্ঞানী লিংলি এখন এখানে আসবে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। সত্যি।"

এবারে আমিও একটু উত্তেজিত হয়ে গেলাম। এতবার বিজ্ঞানী লিংলির এত কথা শুনেছি, তাই মানুষটাকে আমার দেখার খুব আগ্রহ ছিল। আমিও এবারে হাততালি দিতে দিতে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কমান্ড্যান্ট স্টেজের এক পাশে এগিয়ে গেল এবং আমি দেখলাম সে একজন কমবয়সী মানুষকে স্টেজের মাঝখানে নিয়ে এল। খুবই সাদামাটা ধরনের মানুষ, সাদামাটা পোশাক পরে আছে। গায়ের রং রোদে পোড়া, চুলগুলো বেশ লম্বা কাঁধ পর্যন্ত নেমে আছে, চোখগুলো জ্বলজ্বলে।

কমান্ড্যান্ট বলল, "মহাবিজ্ঞানী লিংলি, তুমি আমাদের আমন্ত্রণ রক্ষা করে আজকে কমিউনের এই মিটিংয়ের এসেছ সে জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।"

বিজ্ঞানী লিংলি বলল, "ধন্যবাদ দেওয়ার কিছু নেই। আমি আমার শহরের মানুষদের সাথে কথা বলতেই পারি, এটা এমন কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা নয়।"

কমান্ড্যান্ট বলল, "তোমার কাছে এটা ঐতিহাসিক ঘটনা নাও হতে পারে কিন্তু আমাদের জন্য এটি অনেক বড় একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। যাই হোক, মহামান্য বিজ্ঞানী লিংলি, তোমার আবিষ্কার করা ক্রেনিপিউটার আজ থেকে এই পুরো শহরকে নিয়ন্ত্রণ করছে, সেটা দেখে তোমার কেমন লাগছে?"

বিজ্ঞানী লিংলি হাসি হাসি মুখে বলল, "নিয়ন্ত্রণ করছে বলা হলে সেটা একটু অন্যরকম শোনায়, আমার মনে হয় বলা উচিত শহরের সকল দৈনন্দিন কাজে সহায়তা করছে।"

কমান্ড্যান্টের মুখের হাসি আরো বিস্তৃত হলো, সে বলল, "তোমার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা এবং দূরদৃষ্টির উপর এই শহরের সকল মানুষের অনেক বেশি বিশ্বাস। তুমি যদি তোমার আবিষ্কৃত ক্রেনিপিউটার দিয়ে এই শহরকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণও কর, সবাই সেটা খুব আনন্দের সাথে গ্রহণ করবে।"

হলঘরের সব মানুষ আনন্দের শব্দ করে কমান্ড্যান্টের কথার প্রতি সমর্থন জানাল। বিজ্ঞানী লিংলি তার মাথার এলোমেলো লম্বা চুলকে

পেছনে সরিয়ে বলল, "শুনে খুশি হলাম। তবে আমি সবাইকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, একটা শহর দূরে থাকুক আমি একটা মানুষকেও নিয়ন্ত্রণ করতে চাই না। প্রত্যেকটা মানুষ আসলে এই পৃথিবীর একটা সম্পদ, কারণ প্রত্যেকে একটা মস্তিষ্ক নিয়ে জন্মেছে। সেই মস্তিষ্কের একশ বিলিয়ন নিউরন নিয়ে সে এই পৃথিবীর একটি অনেক বড় সম্ভাবনা। ক্রেনিয়াল দিয়ে সেখানে আমরা নতুন তথ্য দিয়ে নতুন জ্ঞান প্রবেশ করিয়ে তাকে আরো বিকশিত হতে দিতে চাই, কিন্তু কোনোভাবে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাই না, কোনোভাবে তার স্বাধীন সত্তাকে নষ্ট হতে দিতে চাই না।"

কমান্ড্যান্টের একটা সাধারণ কথা শুনেই হলঘরের মানুষেরা হাততালি দিচ্ছিল, লিংলির মতো এত বড় একজন বিজ্ঞানীর কথা শুনে দর্শকেরা মনে হয় একেবারে অভিভূত হয়ে গেল। তারা সবাই দাঁড়িয়ে হাততালি দিতে থাকে।

বিজ্ঞানী লিংলি হাসি হাসি মুখে স্টেজে দাঁড়িয়ে সবাইকে এক নজর দেখে বলল, "সত্যি কথা বলতে কী একজন মানুষের স্বাধীনতা আমার কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ যে, কয়েক দিন আগে আমি জানতে পেরেছিলাম একটি অসভ্য বর্বর বন্য দস্যুদল দুজন কিশোর-কিশোরীকে বন্দি করে রেখেছে। আমি সেই দস্যুদলের সাথে যোগাযোগ করে দস্যুদলকে প্রয়োজনীয় মুক্তিপণ দিয়ে সেই দুজন কিশোর-কিশোরীকে মুক্ত করিয়ে এনেছি।"

আমি আর টিশা চমকে উঠলাম। বিজ্ঞানী লিংলি আমাদের কথা বলছে! আমরা দুজনেই চোখ বড় বড় করে কথাগুলো ভালো করে শোনার চেষ্টা করলাম।

বিজ্ঞানী লিংলি বলল, "আমি যতদূর জানি সেই কিশোর-কিশোরী দুজনকে এই হলঘরে আনা হয়েছে। তারা কোথায়? তোমরা দুজন কি একটু দাঁড়াবে?"

আমি আর টিশা উঠে দাঁড়ালাম এবং হলঘরের সবাই কয়েক-মুহূর্ত অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর আবার আনন্দের শব্দ করে হাততালি দিতে লাগল।

বিজ্ঞানী লিংলি আমাদের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তোমরা দুজন স্টেজে চলে এসো। তোমাদেরকে একটু সামনাসামনি দেখি। একটু কথা বলি।"

আমার আর টিশার বুক ধক ধক শব্দ করতে লাগল। দুজন সাবধানে সারি সারি চেয়ারের মাঝখানে রাখা জায়গা দিয়ে স্টেজের দিকে এগোতে লাগলাম।

স্টেজে ওঠার পর বিজ্ঞানী লিংলি আমাদেরকে ভালো করে দেখার সুযোগ পেল, আমরাও তাকে ভালো করে দেখার সুযোগ পেলাম। দূর থেকে তাকে সাদামাটা একজন মানুষ মনে হচ্ছিল, কাছে থেকে তাকে দেখে বোঝা যায় মানুষটি সাদামাটা নয়, তার চোখগুলোর দৃষ্টি এত তীব্র যে সেদিকে তাকিয়ে থাকা যায় না।

বিজ্ঞানী লিংলি জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের দুজনের নাম?"

আমরা আমাদের নাম বললাম। বিজ্ঞানী লিংলি বলল, "তোমাদের মাথায় ক্রেনিয়াল নেই, বুঝতেই পারছি বয়স এখনো ষোলো হয়নি। এই কম বয়সে পৃথিবীর কোনো বিষয়ে তোমাদের কোনো তথ্য নেই, জ্ঞান নেই, অভিজ্ঞতা নেই—তখন একটা দস্যুদলের হাতে বন্দি! তোমাদের তখন কেমন লাগত?"

আমি বললাম, "খুব খারাপ লাগত। মরে যেতে ইচ্ছে করত।"

বিজ্ঞানী লিংলি মাথা নেড়ে বলল, "না, না। কখনো মারা যাবার কথা বলবে না। একজন মানুষ অনেক বড় একটি ব্যাপার, সে কখনো মরে যাবার কথা বলতে পারে না।"

আমরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলাম। বিজ্ঞানী লিংলি বলল, "দস্যুদল তোমাদের কী রকম অত্যাচার করত, একটু বলবে?"

আমি টিশার দিকে তাকালাম। টিশা মাথা নাড়ল, ফিসফিস করে বলল, "আমি বলতে চাই না। তুমিই বলো।"

আমি তখন মায়ী মায়ীর কিছু অত্যাচারের কথা বললাম এবং আমার কথা শুনে হলঘরের মানুষ কেমন শিউরে শিউরে উঠতে লাগল। আমার কথা শেষ হবার পর সবাই নিঃশব্দে বসে রইল। বিজ্ঞানী লিংলি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "ছেলে। তোমাদের

দুঃখের এবং কষ্টের দিন শেষ হয়েছে। আমি তোমাদের মুক্ত করে এনেছি। এই শহরে তোমরা এখন মুক্ত মানুষের মতো থাকো। জীবন উপভোগ করো।"

আমি নিচু গলায় বললাম, "করব। জীবন উপভোগ করব।"

বিজ্ঞানী লিংলি বলল, "তোমরা দুজন এখন এখানে কী ধরনের জীবন চাও?"

আমি আর টিশা একজন আরেকজনের দিকে তাকালাম। এই প্রশ্নটির কী উত্তর দেওয়া যায়? সত্যি কথা বলতে হলে বলতে হবে যে, আমরা স্বাধীন একটা জীবন চাই। কিছুই করতে চাই না, কোনো গাছের ছায়ায় বসে ভিডি টিউবে বই পড়তে চাই। কিন্তু মনে হলো সেটা বলা ঠিক হবে না।

আমাদের চুপ করে থাকতে দেখে বিজ্ঞানী লিংলি নিজে থেকে বলল, "তোমরা কি আমার ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে চাও? "

আমরা কিছু বলার আগেই হলঘরের সব মানুষ আমাদের এত বড় সৌভাগ্যের কথা শুনে আনন্দে চিৎকার করে উঠল। বোঝাই যাচ্ছে, এই শহরের খুব সৌভাগ্যবান অল্প কিছু মানুষ লিংলির মতো এত বড় একজন বিজ্ঞানীর ল্যাবরেটরিতে কাজ করার সুযোগ পায়।

কমান্ড্যান্ট এতক্ষণ কোনো কথা বলছিল না, এবারে আমাদের পিঠে হাত দিয়ে বলল, "অভিনন্দন রিহি এবং টিশা! এই শহরের খুব অল্প কিছু তরুণ-তরুণী বিজ্ঞানী লিংলির সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছে।"

আমি আর টিশা হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রইলাম। বিজ্ঞানী লিংলি বলল, "আমার ল্যাবরেটরি কমপ্লেক্সে থাকার জন্য হোস্টেল আছে, ডরমিটরি আছে। আমি তোমাদের সেখানে থাকার ব্যবস্থা করে দেব।"

আমি বললাম, "তোমাকে অনেক ধন্যবাদ মহামান্য লিংলি।"

টিশা কোনো কথা না বলে বিচিত্র এক ধরনের দৃষ্টিতে বিজ্ঞানী লিংলির দিকে তাকিয়ে রইল।

১২.

পরদিন ভোর বেলা আমাকে আর টিশাকে বিজ্ঞানী লিংলির ল্যাবরেটরি কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হলো। অনেক উঁচু একটা বিল্ডিংয়ের লিফটে করে আমরা দুজন যখন উপরে উঠছিলাম তখন আমি ফিসফিস করে টিশাকে বললাম, "আমাদের কি এখন হোস্টেলে নিয়ে যাচ্ছে?"

টিশা কোনো কথা বলল না। কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে টিশা হঠাৎ করে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। লিফটটি প্রায় বাইশ তলা ওঠার পর বন্ধ হয়ে গেল, তখন আমরা লিফট থেকে নামলাম। আমাদের সাথে যে মানুষটি ছিল সে আমাদেরকে বলল, "তোমাদের এখন সিঁড়ি দিয়ে বাকি দুই তলা উঠতে হবে। এর উপরের অংশে লিফট যায় না।"

আমি আর টিশা অবাক হলাম, এত উঁচু বিল্ডিংয়ের একেবারে উপরে পর্যন্ত লিফট যায় না সেটি কেমন ব্যাপার? কিন্তু আমাদের এ নিয়ে কথা বলার কিংবা তর্ক-বিতর্ক করার কোনো সুযোগ নেই, আমরা তার চেষ্টাও করলাম না। আমরা আমাদের ব্যাগ নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগলাম, যে মানুষটি আমাদের এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে সে আমাদের সাথে আর উপরে উঠল না।

আমাদের কয়েকটা চেকপোস্ট পার হতে হলো, কোথাও কোনো মানুষ নেই, চেকপোস্ট পার হওয়ার জন্য কী করতে হবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার নির্দেশ দেওয়া হতে লাগল। আমরা সেই নির্দেশ মেনে এগিয়ে যেতে থাকলাম। কোনো চেকপোস্টে রেটিনা স্ক্যান

করতে হলো, কোনো চেকপোস্টে ত্বকের পরিত্যক্ত কোষ দিয়ে ডিএনএ টেস্ট করতে হলো।

শেষ চেকপোস্টটা আমাদের পুরো শরীর স্ক্যান করে একটা ঘরে ঢুকতে দিল। প্রথমে টিশা, তার পিছু পিছু আমি। ঘরটাতে ঢোকার সাথে সাথে পিছনের স্বয়ংক্রিয় দরজাটা বন্ধ হয়ে যাবার সাথে সাথে আমি হঠাৎ করে এক ধরনের আতঙ্ক অনুভব করি। কারণ দরজাটির কোনো হাতল নেই, কোনো চাবির গর্ত নেই, মনে হলো ধাতব একটি দেয়াল দিয়ে আমাদের একটা ঘরে বন্দি করে ফেলা হয়েছে। আমি আর টিশা আমাদের ব্যাগ হাতে নিয়ে আরেকটু এগিয়ে গেলাম, সামনে এগোতেই একটা দরজা খুলে গেল এবং আমরা একটা হলঘরের মতো জায়গায় পৌছলাম। হলঘরটির মেঝে এবং দেয়াল ধূসর বর্ণের, দেখে কেমন যেন মন খারাপ হয়ে যায়।

আমি বললাম, "আমরা কোথায় এসেছি। এটাকে মোটেও একটা হোস্টেল মনে হচ্ছে না।"

টিশা এবারেও কোনো কথা বলল না, তার হাতের ব্যাগটি নিয়ে সোজা সামনের দিকে এগিয়ে গেল। দেয়ালের কাছাকাছি পৌছতেই নিঃশব্দে একটা দরজা খুলে গেল। আমরা সেই দরজা দিয়ে পাশের ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালাম, আমাদের সামনে অনেকগুলো নানা বয়সী মানুষ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। কেউ বলে দেয়নি কিন্তু দেখেই বুঝতে পারলাম আমাদেরকে যেভাবে এখানে আনা হয়েছে এই মানুষগুলোকেও ঠিক একইভাবে এখানে আনা হয়েছে।

মানুষগুলো পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি অভিবাদনের ভঙ্গি করে হাত নেড়ে বললাম, "শুভ সকাল।" কী কারণ জানা নেই কথাটা খুবই বেখাপ্পা শোনাল।

মানুষগুলো কেউ কোনো কথা বলল না, শুধু মনে হলো পেছন থেকে কমবয়সী একজন হাসির মতো শব্দ করল, আনন্দহীন এক ধরনের হাসি। এই হাসিটি শুনে আমি বুঝতে পারলাম সকালটি আর যাই হোক শুভ নয়।

আমি বললাম, "আমার নাম রিহি। আর এ হচ্ছে টিশা।"

ভেবেছিলাম মানুষগুলোর ভেতর থেকে কেউ একজন নিজের পরিচয় দেবে, কিন্তু কেউ কোনো কথা বলল না। স্থির দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তোমরা কারা?"

মানুষগুলো এবারেও কোনো কথা বলল না, আমার মনে হলো কথা বলবেও না। কিন্তু হঠাৎ করে একজন বলল, "আমরা কারা তাতে কিছু আসে যায় না।"

আমি ভুরু কুঁচকে বললাম, "মানে?"

"মানে আমাদের নিজের পরিচয়ের এখন আর কোনো গুরুত্ব নাই। তুমি কে আমি কে তাতে কিছু আসে যায় না। আগে হোক পরে হোক তোমাকে আমাকে সবাইকে দেয়ালের ঐ পাশে চলে যেতে হবে।"

"দেয়ালের ঐ পাশে কী আছে?"

মানুষটা উত্তর দেওয়ার আগেই টিশা বলল, "ক্রেনিপিউটার।"

যারা স্থির দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়েছিল এই প্রথমবার তাদের চোখে এক ধরনের কৌতূহল ফুটে উঠল। একজন টিশার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী বললে?"

"আমি বলেছি ক্রেনিপিউটার।"

"তুমি কেমন করে জান ওখানে ক্রেনিপিউটার আছে? আমাদেরকে কেন ক্রেনিপিউটারের ঘরে নিয়ে যাবে?"

টিশা বলল, "তা না হলে কেন আমাদের একজন একজন করে এখানে ধরে এনেছে?"

আমি টিশাকে বাধা দিয়ে বললাম, "তুমি কী বলছ টিশা? আমাদেরকে মোটেও ধরে আনা হয়নি। বিজ্ঞানী লিংলি নিজে বলেছে আমাদের এই ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে দেবে। আমাদের সব দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা শেষ করে দেবে।"

"রিহি! তোমার এবং আমার থেকে বেশি ভালো করে কে জানে যে একজন মানুষের দুঃখ কষ্ট আর যন্ত্রণা দূর করে দেবার জন্য দরকার একটি বেগুনি নীল তিন তিন দুই চার ক্রেনি-টিউব!"

বেগুনি নীল তিন তিন দুই চার কোড নম্বরের ক্রেনি-টিউব মাথায় ঢুকিয়ে দিলে মুহূর্তে একজন মানুষের ভেতর সব দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা উধাও হয়ে ভেতরে এক ধরনের প্রশান্তি নেমে আসে! মায়ী মায়ীর বাক্স থেকে আমরা যে টিউবগুলো চুরি করে এনেছি তার মাঝে এই কোড নম্বরের একটা ক্রেনি-টিউব আছে!

আমি কিছুক্ষণের জন্য টিশার দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, "তুমি কি মনে কর বিজ্ঞানী লিংলি আমাদের সাথে মিথ্যা কথা বলেছে?"

"না। বিজ্ঞানী লিংলি মিথ্যা কথা বলেনি। সত্যি কথা বলেছে। আমাদেরকে ল্যাবরেটরি কমপ্লেক্সে এনেছে। এখানে কাজ করতে দেবে—আমাদের সব দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে যাবে—সব সত্যি। তবে যেভাবে সেটা করা হবে তুমি সেটা পছন্দ করবে কি করবে না সেটা ভিন্ন কথা!"

আমি হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম টিশা যেটা সন্দেহ করেছে সেটা হয়তো সত্যি। হঠাৎ করে আমি এক ধরনের আতঙ্ক অনুভব করতে থাকি। আমাদের পাশে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমাদের সাথে কি বিজ্ঞানী লিংলির দেখা হয়?"

কমবয়সী একজন মেয়ে বলল, "হয়, আবার হয় না।"

"তার মানে কী?"

কমবয়সী মেয়েটি বড় একটা দেয়াল দেখিয়ে বলল, "মাঝে মাঝে এই দেয়ালটা স্বচ্ছ হয়ে যায়। তখন দেয়ালের অন্য পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞানী লিংলি আমাদের দেখে।"

"কী দেখে?"

"আমি জানি না। "

"তোমরা সারাদিন কী কর?"

"কিছু করি না। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করি, দেখি নতুন কে আসে।"

"প্রতিদিন নতুন মানুষ আসে?"

"আসে আবার চলেও যায়। ধরে নিয়ে যায়। আমাকেও একদিন ধরে নিয়ে যাবে।" মেয়েটা এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, "তোমাকেও ধরে নিয়ে যাবে।"

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। শুধুমাত্র কিছু একটা বলার জন্য বললাম, "তোমরা কোথায় ঘুমাও?" মেয়েটা হাত নেড়ে বলল, "এই তো এখানে ঘুমাই।"

"কী খাও?"

"একজন ডিটিউন মানুষ খাবার আনে। সাথে একজন গার্ড থাকে। তার হাতে সব সময় অস্ত্র থাকে। স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র।"

আমি কথা বলার মতো আর কিছু খুঁজে পেলাম না। যে দেয়ালটি মাঝে মাঝে স্বচ্ছ হয়ে যায় আর স্বচ্ছ হবার পর অন্য পাশে লিংলিকে দেখা যায় আমি সেই দেয়ালটিতে হেলান দিয়ে চুপ করে বসে রইলাম।

দুই দিন পর হঠাৎ করে দেয়ালটি স্বচ্ছ হয়ে গেল। আমি প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম এবং দেখলাম অন্যপাশে বিজ্ঞানী লিংলি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি উত্তেজিতভাবে চিৎকার করে বললাম, "বিজ্ঞানী লিংলি! মহামান্য বিজ্ঞানী লিংলি। আমি রিহি। যাকে তুমি দস্যুদলের কাছ থেকে মুক্ত করেছ!"

বিজ্ঞানী লিংলি আমার কথা শুনতে পেয়েছে কি না বুঝতে পারলাম না। সে এক ধরনের অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। হেঁটে পিছনে গেল, পেছনের একটা টেবিল থেকে একটা কাচের গ্লাসে কোনো এক ধরনের তরল পানীয় ঢেলে নিল, সেই পানীয়ে চুমুক দিয়ে আবার সামনে এগিয়ে এসে স্বচ্ছ দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আমি আবার চিৎকার শুরু করলাম, শুধু চিৎকারের উপর ভরসা না করে আমি

এবারে দুই হাত নেড়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করতে লাগলাম। মনে হলো বিজ্ঞানী লিংলি প্রথমবার আমাকে দেখতে পেল এবং তার চোখে-মুখে এক ধরনের কৌতূহল ফুটে উঠল। সে এগিয়ে গিয়ে কোথায় একটা সুইচ টিপে দেবার পর সে আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, আমিও তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। বিজ্ঞানী লিংলি বলল, "ছেলে! তুমি এভাবে চিৎকার করছ কেন? তোমার কী হয়েছে?"

আমি বললাম, "মহামান্য লিংলি! তোমার মনে আছে, তুমি আমাকে আর আমার বন্ধু টিশাকে দস্যুদলের কাছ থেকে মুক্ত করেছ? দুই দিন আগে কমিউনের সভায় তোমার সাথে—"

কথার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে লিংলি বলল, "মনে আছে। তোমার সমস্যা কী?"

"তুমি বলেছিলে তুমি আমাদের সব দুঃখ কষ্ট দূর করে একটা নতুন জীবন উপহার দেবে!"

"বলেছিলাম নাকি?"

"হ্যাঁ। তুমি কমিউনের মানুষের সামনে—"

আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বিজ্ঞানী লিংলি হাত নেড়ে পুরো বিষয়টা উড়িয়ে দেবার মতো ভঙ্গি করে বলল, "কমিউনের সভায় অনেক কথা বলতে হয়। তোমাদের মুক্ত করতে অনেক মুক্তিপণ দিতে হয়েছে, সেটি কি শুধু শুধু দিয়েছি?"

আমি একটু হতবুদ্ধি হয়ে বললাম, "তাহলে আমাদের কী করবে?"

"তোমাদের আনা হয়েছে ক্রেনিপিউটার বানানোর জন্য। তোমাদের মাথায় ক্রেনিয়াল নেই—আমার এরকম মানুষই দরকার। ক্রেনিয়াল দিয়ে মাথায় শুধু তথ্য দেওয়া যায়, তথ্য বের করা যায় না। আমি নতুন ক্রেনিয়াল তৈরি করেছি, সেটা বাই-ক্রেনিয়াল। এটা দিয়ে তথ্য দেওয়া যায় আবার তথ্য বের করে আনা যায়। মাথায় এটা লাগালে—"

বিজ্ঞানী লিংলি হঠাৎ কথা থামিয়ে হা হা করে হাসতে লাগল। এখানে হাসির ব্যাপারটা কোথায় আমি ধরতে পারলাম না। বিজ্ঞানী

লিংলি একসময় হাসি থামিয়ে তার পানীয়ের গ্লাসে চুমুক দিল, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখটা মুছে বলল, "আমি তোমাদের কেন এই সব কথা বলছি? তোমাদের মাথায় কোনো ক্রেনিয়াল নেই, তোমরা কিছু শিখো নাই, তোমরা কিছু জানো না, বোঝো না! তোমাদের মানসিক বয়স ছয়-সাত বছরের বেশি নয়, আমি তোমাদের যেসব কথা বলছি সেগুলো তোমাদের বোঝা সম্ভব না! তোমরা হয়তো দুই আর দুই যোগ করলে কত হয় সেটাই জান না!"

এতক্ষণ টিশা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিল। এই প্রথম সে কথা বলল, "দুই আর দুই যোগ করলে কত হয় আমরা জানি। শুধু দুই আর দুই নয় প্রাইমভিত্তিক সংখ্যা দিয়ে আমরা যে কোনো সংখ্যা প্রক্রিয়া করতে পারি। ক্রেনিয়াল কীভাবে কাজ করে আমরা সেটা জানি। শহরের মানুষের ক্রেনিয়ালে তথ্য দেবার জন্য তুমি নেটওয়ার্ক ব্যবহার কর, মূল সার্ভার ছাড়া সেখানে তথ্য দেওয়া যায় না কিন্তু দস্যুদলের কাছে অনেক দামে বিক্রি করার জন্য তুমি ক্রেনি-টিউব তৈরি করেছ আমরা সেটাও জানি। বেগুনি নীল তিন তিন দুই চার হচ্ছে এরকম একটা কোড। এই কোডের ক্রেনি-টিউব কী করে আমি সেটাও বলতে পারব।"

বিজ্ঞানী লিংলির চোখ দেখতে দেখতে বিস্ফারিত হয়ে যায়। কয়েক মুহূর্ত সে কোনো কথা বলতে পারে না, এমন কী হাতে ধরে রাখা পানীয়ের গ্লাসে চুমুক দিতেও সে ভুলে যায়। একটু পর বুক থেকে একটা নিঃশ্বাস বের করে দিয়ে বলল, "তুমি এগুলো কোথা থেকে জেনেছ?"

"প্রাচীন মানুষেরা যেভাবে জানত সেভাবে জেনেছি।"

"মানে?"

"ভিডি টিউবে বই পড়ে জেনেছি। আমি দেখতে চেয়েছিলাম মাথায় ক্রেনিয়াল টিউব না লাগিয়ে শেখা যায় কি না, জানা যায় কি না। আমি এখন জানি এটা সম্ভব। তোমাদের ক্রেনিয়াল প্রযুক্তির কোনো প্রয়োজন নেই। এটা আসলে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার একটা কৌশল।"

বিজ্ঞানী লিংলি কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে টিশার দিকে তাকিয়ে রইল তারপর কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "তোমার বয়স কৃত মেয়ে?"

"আমার নাম টিশা।"

বিজ্ঞানী লিংলি মনে হলো বিশ্বাস করতে পারল না যে কেউ তার সাথে এভাবে কথা বলতে পারে। টিশার সূক্ষ্ম খোঁচাটি সহ্য করে আবার জিজ্ঞেস করল, "টিশা, তোমার বয়স কত?"

"তুমি একটু আগে বলেছ আমাদের মানসিক বয়স ছয়-সাত বছরের বেশি না। আমার ধারণা আমার মানসিক বয়স আরো অনেক বেশি—তোমার সমান যদি নাও হয় তার কাছাকাছি হবে। জৈবিক বয়স পনের বছর। পনের বছর দুই মাস এগার দিন।"

বিজ্ঞানী লিংলির মুখে খুব ধীরে ধীরে একটা হাসি ফুটে উঠল। মানুষের মুখের হাসির মতো বিচিত্র আর কিছু পৃথিবীতে আছে কি না আমার জানা নেই। কোনো কথা না বলে শুধু মুখের হাসি দিয়ে কত কিছু প্রকাশ করে ফেলা যায়! লিংলি তার মুখের হাসি দিয়ে বুঝিয়ে দিল যে, এই পৃথিবীতে তার থেকে ভয়ংকর আর নিষ্ঠুর মানুষ আর একটিও নেই! তার কাছে পনের বছর দুই মাস এগার দিনের একটা মেয়ের কোনো মূল্য নেই। নিজের প্রয়োজনে সে টিশার মতো শত শত মানুষকে যেভাবে প্রয়োজন সেভাবে ব্যবহার করবে।

বিজ্ঞানী লিংলি তার মুখের ভয়ংকর হাসিটি ধরে রেখে বলল, "টিশা! আমি তোমাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছি! তুমি যদি আমার ল্যাবরেটরি কমপ্লেক্সের ক্রেনিপিউটার বিল্ডিংয়ের চোদ্দ তলায় আটকা না থাকতে, তাহলে তুমি সবার জন্য একটা বিপজ্জনক মানুষ হতে পারতে! কিন্তু তুমি এখন বিপজ্জনক নও। তুমি পুরোপুরি আমার হাতের মুঠোয়। তোমার শরীরের এক দশমিক তিন কেজি ওজনের মস্তিষ্কটুকু ছাড়া আর কোনো কিছুতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। আমার ক্রেনিপিউটারের দুশ বায়ান্নটি মস্তিষ্কের মাঝে তোমারটাও যুক্ত হবে। শুধু তোমারটা না তোমাদের সাথে যারা আছে তাদের সবার! তোমার চমৎকার বুদ্ধিদীপ্ত তথ্যবহুল সৃজনশীল তেজস্বী মস্তিষ্কটিকে এক সেকেন্ডে আমি একশ বিলিয়ন নিউরনের একটা হার্ডওয়ারে পাল্টে

দেব। তথ্য পাঠাব তোমার মস্তিষ্কে সেই তথ্য প্রক্রিয়া করে আমাকে ফেরত পাঠাবে। তুমি থাকবে না, শুধু তোমার মস্তিষ্কটা থাকবে! বুঝেছ?"

টিশা বলল, "আমি এই সব কথা জানি। তুমি যদি সত্যিই আমাকে কিছু বলতে চাও তাহলে আমি যেগুলো জানি না সেগুলো আমাকে বলো।"

"তুমি কী জান না?"

"যেসব কথা বইয়ে লেখা হয়নি আমি সেগুলো জানি না। তোমার ক্রেনিপিউটার কীভাবে কাজ করে আমি জানি না। মানুষের মস্তিষ্ক ব্যবহার করতে হলে মানুষটিকে জীবিত থাকতে হয়। এতগুলো মানুষকে জীবিত রাখ কেমন করে সেটা আমি জানি না। তার শরীরের পুষ্টি দরকার—"

"টিশা, তোমার প্রশ্নটা খুবই সঠিক। কীভাবে ক্রেনিপিউটার বানাব আমি অনেক দিন থেকে জানি কিন্তু কীভাবে এতগুলো মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা যায়, আমি সেটা জানতাম না। টিশা, তুমি শুনে খুব খুশি হবে আমি সেই সমস্যাটা খুবই চমৎকারভাবে সমাধান করেছি। যেদিন তোমাকে ক্রেনিপিউটারে জুড়ে দেব সেদিন তুমি নিজের চোখে দেখবে! দেখে চমৎকৃত হবে!" কথা শেষ করে বিজ্ঞানী লিংলি আনন্দে আবার হা হা করে হাসল!

টিশা হাসি থেমে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করল। যখন হাসি থেমে গেল তখন জিজ্ঞেস করল, "মানুষগুলোর মস্তিষ্কের বাই-ক্রেনিয়াল থেকে যে সিগন্যাল আসে সেগুলো তুমি কোথায় প্রক্রিয়া করো?"

বিজ্ঞানী লিংলি বলল, "আমি সেটা কীভাবে করি পৃথিবীর কেউ জানে না! এটা আমার আবিষ্কার, আমি ছাড়া আর কেউ কখনো জানবে না!"

টিশা মুখ শক্ত করে বলল, "আমি সেটা জানতে চাই। তুমি আমাকে ক্রেনিপিউটারে জুড়ে দিয়ে শুধু আমার স্মৃতি নয়—আমার অস্তিত্বকেও ধ্বংস করে দেবে—আমাকে বলো, আমি জানা না জানায় এখন তোমার কিছু আসে যায় না!"

বিজ্ঞানী লিংলি মাথা নাড়ল, বলল, "না আমি তোমাকে বলব না। যদি বলিও তুমি বুঝবে না।"

"আমি বুঝব। তুমি চেষ্টা করে দেখো।"

"না, আমি বলব না।"

এবারে টিশা খিলখিল করে হেসে উঠল, তার হাসি থামতেই চায় না। বিজ্ঞানী লিংলি অবাক হয়ে বলল, "এই মেয়ে, তুমি হাসছ কেন?"

টিশা হাসি থামিয়ে মুখ শক্ত করে বলল, "আমার নাম টিশা।"

বিজ্ঞানী লিংলি খোঁচাটি সহ্য করে বলল, "টিশা, তুমি কেন হাসছ?"

"সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী লিংলি পনের বছর দুই মাস এগার দিনের একটা মেয়ের বুদ্ধিমত্তাকে এত ভয় পায় যে তাকে দুই দিন পরে পুরোপুরি ধ্বংস করে ফেলবে জেনেও তাকে কিছু তথ্য জানাতে সাহস পায় না। এটা আমার জন্যে খুবই হাসির ব্যাপার।" টিশা তীব্র দৃষ্টিতে বিজ্ঞানী লিংলির দিকে তাকিয়ে হিংস্র গলায় বলল, "তুমি যত বড় বিজ্ঞানীই হও না কেন লিংলি, তোমার যত ক্ষমতাই থাকুক না কেন, আসলে তুমি একজন দুর্বল মানুষ। তুমি একজন ভীতু কাপুরুষ ছাড়া আর কিছু নও।"

টিশার কথাটা শেষ হওয়ার আগেই স্বচ্ছ দেয়ালটি হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে কালো দেয়াল হয়ে গেল। টিশা যখন মাথা ঘুরিয়ে ভেতরে তাকাল, দেখল, ঘরের ভেতরের সব কয়জন মানুষ স্থির চোখে টিশার দিকে তাকিয়ে আছে।

তাদের চোখে ভয় আতঙ্ক আর বিস্ময়। তবে চোখের দৃষ্টিতে সবচেয়ে যেটা বেশি, সেটা হচ্ছে অবিশ্বাস।

১৩.

সকালবেলা আরো তিনজন মানুষ আমাদের সাথে যোগ দিল, তাদের সবার চোখে-মুখে এক ধরনের দিশেহারা ভাব। তারা কোথা থেকে এসেছে, কেমন করে এসেছে সেটি নিয়ে কারো মাঝে কোনো কৌতূহল নেই। সবাই এক ধরনের স্থির নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল, আমিও মনে হয় একইভাবে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনজন খুবই ব্যাকুলভাবে সবার সাথে কথা বলতে চেষ্টা করল, কেউ তাদের কথার উত্তর দেবার চেষ্টা করল না—কারণটি সহজ, উত্তর দেবার মতো সে রকম কিছু নেই।

দুপুরবেলার দিকে আমাদের জন্য একজন ডিটিউন করা তরুণী খাবার নিয়ে এল। খাবারের কার্টটা ঠেলে ঠেলে সে হলঘরের মাঝখানে এনে রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। আমরা দেখেছি, একেবারে নিঃশব্দে সে ঘণ্টা খানেক দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর খালি কার্টটাকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে বের হয়ে যায়। ডিটিউন করা এই তরুণীটির পেছনে পেছনে একজন সশস্ত্র মানুষ থাকে, এই মানুষটি তার স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি সবার দিকে তাক করে রাখে। এই মানুষটি ডিটিউন করা নয়, কিন্তু তবু সে কারো সাথে কথা বলে না। মানুষটির মুখে এমন একটা নিষ্ঠুরতার ছাপ রয়েছে যে কেউ তার সাথে কথা বলার সাহস করে না।

আজকে দুপুরবেলা যখন ডিটিউন করা বিষণ্ন তরুণীটি এবং তাকে পাহারা দিয়ে নিষ্ঠুর চেহারার সশস্ত্র মানুষটি খাবার নিয়ে এল তখন টিশা হলঘরের দেয়ালে হেলান দিয়ে অন্যমনস্কভাবে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি টিশাকে খুব ভালো করে চিনি তাই আমি বুঝতে

পারলাম টিশা মোটেও অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে নেই, সে তীক্ষ্ণ মনোযোগ দিয়ে এই দুজনকে দেখছে, সে কিছু একটা ভাবছে, কিছু একটা পরিকল্পনা করছে।

আমার অনুমান সত্যি, কারণ ঘণ্টা খানেক পর যখন ডিটিউন করা তরুণীটি খাবারের কার্ট ঠেলে ঠেলে বের হয়ে গেল তখন টিশা আমাকে ডাকল, বলল, "রিহি, আমি কি তোমার সাথে একটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারি?"

আমি টিশার পাশে বসে বললাম, "কী বিষয় নিয়ে কথা বলবে?"

"বিজ্ঞানী লিংলিকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আমি কিছু একটা করতে চাই।"

শুনে আমি চমকে উঠলাম। কয়েক সেকেন্ড আমি কোনো কথা বলতে পারলাম না। টিশা বলল, "বিজ্ঞানী লিংলি আমাদেরকে এমনিতেই শেষ করে দেবে। শুধু শুধু তাকে আমাদের শেষ করতে দেব কেন? কোনো একটা ঘরে আমাদের শরীরটা ফেলে রেখে আমাদের মস্তিষ্কটা ব্যবহার করবে। কেন তাকে আমার মস্তিষ্ক ব্যবহার করতে দেব? আমি বিজ্ঞানী লিংলিকে আমার মস্তিষ্ক ব্যবহার করতে দেওয়ার চেয়ে সেটাকে থেঁতলে নষ্ট করে দেব।"

আমি কিছুক্ষণ টিশার দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, "তুমি কী করতে চাও?"

"প্রথমে এই ঘর থেকে বের হতে চাই।"

"কেমন করে বের হবে?"

"এখান থেকে বের হওয়ার একটাই পথ। ডিটিউন করা মেয়েটা আর সশস্ত্র মানুষটা যখন এখানে আসবে তখন তাদের কাবু করে আমরা এখান থেকে বের হয়ে যাব।"

আমি ভয় পাওয়া গলায় বললাম, "কাবু করে?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি কাবু করতে পারবে?"

"আমি একা করব না। তুমি আমাকে সাহায্য করবে।"

"আমরা দুজন মিলে কাবু করব?"

টিশা মুখ শক্ত করে বলল, "হ্যাঁ আমরা দুজনে মিলে চেষ্টা করব। কেন সবকিছু চেষ্টা না করে ছেড়ে দেব?"

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, "আর কী চেষ্টা করবে?"

"এখান থেকে বের হয়ে ক্রেনিপিউটারটা খুঁজে বের করব। তারপর সেটা ধ্বংস করব।"

"ধ্বংস করতে পারবে?"

টিশা বিচিত্র একটা ভঙ্গিতে একটু হেসে বলল, "একটা জিনিস তৈরি করা খুব কঠিন, সেটাকে ধ্বংস করা খুব সোজা।"

আমি মাথা নাড়লাম, মনে হয় টিশা খুব ভুল কথা বলেনি। একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, "আমরা দুজন কি অস্ত্র হাতের মানুষটা কাবু করতে পারব?"

টিশা বলল, "কেন পারব না? তুমি একটা জিনিস ভুলে যাচ্ছ কেন?"

"কী জিনিস?"

"মনে নেই মায়ী মায়ীর বাক্স থেকে আমরা কতগুলো ক্রেনিয়াল টিউব চুরি করে এনেছি? এর মাঝে একটা হচ্ছে কুকুরের টিউব। সেই টিউব ক্রেনিয়ালে লাগিয়ে দিতেই মানুষটা চোখের পলকে কুকুর হয়ে যায় মনে আছে?"

"হ্যাঁ, মনে আছে।"

"তার মানে বুঝেছ?"

আমি তখনো টিশা কী বলতে চাচ্ছে বুঝিনি, মাথা নেড়ে বললাম, "বুঝিনি।"

"তার মানে কেউ যদি সাহায্য নাও করে শুধু তুমি আর আমি মিলে মানুষটাকে কাবু করতে পারব।"

আমি ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলাম, "কীভাবে?"

"মনে করো, তুমি গিয়ে তার অস্ত্রটা খপ করে ধরে ফেললে, কিছুতেই ছাড়বে না, মানুষটা তখন অস্ত্রটা তোমার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করবে। যখন হুটোহুটি হতে থাকবে তখন আমি পেছন থেকে তার মাথার ক্রেনিয়ালে ঘ্যাচ করে কুকুরের টিউবটা ঢুকিয়ে

দেব। সেকেন্ডের মাঝে ভয়ংকর সশস্ত্র গার্ড হয়ে যাবে একটা নেড়ি কুকুর।"

আমি চিন্তা করে দেখলাম, টিশা খুব ভুল কথা বলেনি। আমাদের কাছে যে বেশ কয়েকটা ক্রেনি-টিউব আছে সেটা কেউ জানে না। আমরা যে পেছন থেকে কারো ক্রেনিয়ালে একটা ক্রেনি-টিউব ঢুকিয়ে দিতে পারি সেটা কেউ সন্দেহ করবে না। আমি মাথা নেড়ে বললাম, "তোমার বুদ্ধিটা খারাপ না টিশা। খুবই বিপজ্জনক কিন্তু খারাপ না।"

টিশা বলল, "যে কোনো বুদ্ধি বিপজ্জনক! তা ছাড়া এখন বিপদের ভয় করার সময় চলে গেছে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ডিটিউন করা মেয়েটি নিয়ে কী করবে?"

"ঐ মেয়েটি তো কিছু বোঝে না, তাকে নিয়ে তো কোনো ভয় নেই।"

আমি একটু চিন্তা করে বললাম, "আমাদের কাছে বেশ কয়েকটা ক্রেনি-টিউব আছে, তাই না?"

"হ্যাঁ আছে।"

"তার মাঝে একটা নিউট্রাল টিউব রয়েছে মনে আছে?"

টিশা মাথা নাড়ল, বলল, "মনে আছে। আমরা রিয়ানাকে একটা দিয়েছিলাম।"

"হ্যাঁ। ঐ নিউট্রাল টিউবটা যদি আমরা ডিটিউন করা মেয়েটার মাথায় লাগিয়ে দিই তাহলে কী হবে? সে কি ঠিক হয়ে যাবে?"

টিশাকে মুহূর্তের জন্য একটু বিভ্রান্ত দেখায়, তারপর মাথা নেড়ে বলল, "তুমি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলেছ রিহা। একজনকে ডিটিউন করার সময় তার মস্তিষ্কের ভেতর কী করে আমরা জানি না, যদি সেটা অক্ষত থাকে তাহলে নিউট্রাল টিউব দিয়ে নিশ্চয়ই ঠিক করা যাবে! রিহি, তুমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলেছ! যদি এটা কাজ করে তাহলে আমরা সব ডিটিউন করা মানুষকে ঠিক করে ফেলতে পারব।"

"তার আগে আমাদের এখান থেকে বের হতে হবে।"

"হ্যাঁ।" টিশা মাথা নাড়ল, বলল, "আগে এখান থেকে বের হতে হবে।"

আমি তখন আশেপাশের সব মানুষকে দেখিয়ে বললাম, "আমার মনে হয় আমরা কী করতে চাচ্ছি সেটা সবাইকে জানিয়ে রাখা ভালো। তারা আমাদের সাহায্য যদি নাও করে বাধা যেন না দেয়।"

টিশা বলল, "হ্যাঁ। ঠিকই বলেছ।"

এখানে যারা আছে মানসিকভাবে সবাই এত বিপর্যস্ত যে তাদের ভেতরে কোনো ধরনের আগ্রহ কৌতূহল বা অনুভূতি নেই। তাদেরকে কিছু বলার জন্য ডেকে একত্র করা যাবে বলে মনে হয় না। তাই টিশা তার চেষ্টা করল না, সে হলঘরের মাঝখানে একটা চেয়ার এনে তার উপর দাঁড়িয়ে রইল।

ঘরে যারা ছিল তারা ধীরে ধীরে টিশার সামনে জড় হলো। যখন বেশ কয়েকজন এসে একত্র হয়েছে তখন টিশা গলা উঁচিয়ে বলল, "তোমরা কারা কারা এখান থেকে বের হতে চাও?"

যারা সামনে দাঁড়িয়েছিল তারা কেমন যেন চমকে উঠল, একজন আরেকজনের দিকে তাকাল, তারপর ঘুরে টিশার দিকে তাকাল। কিন্তু কেউ কোনো কথা বলল না। টিশা বলল, "তাহলে তোমরা কেউ এখান থেকে বের হতে চাও না?"

মধ্য বয়স্ক একজন বলল, "তুমি নিশ্চয়ই তামাশা করছ। তোমার মতো একজন বাচ্চা মেয়ে আমাদেরকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাবে?"

টিশা এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ।"

"কীভাবে?"

"আমি এখন সেটা তোমাদের বলব না। তোমরা নিজেরাই দেখবে। তবে—"

"তবে কী?"

"আমরা যখন আমাদের কাজ শুরু করব, তোমরা এমন কিছু করবে না যার জন্য আমাদের ঝামেলা হয়।"

পেছনে দাঁড়ানো একজন বলল, "তুমি এখানে যা বলছ তার সবকিছু বাইরে থেকে দেখছে, বাইরে থেকে শুনছে। এক্ষুনি কেউ এসে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে।"

টিশা বলল, "না । নেবে না।"

"তুমি কেমন করে জান?"

"আমি জানি। আমি পরীক্ষা করেছি। এই ঘরটি গোপন ঘর—বিজ্ঞানী লিংলি ছাড়া আর কেউ এই ঘরের খবর রাখে না।"

টিশা তার চেয়ার থেকে নেমে আবার হলঘরের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়ল। আমি তার পাশে গিয়ে বসার পর টিশা আমাদের ব্যাগটা খুলে ব্যাগের লাইনিংগুলোর ভেতর লুকানো ক্রেনি-টিউবগুলো বের করল। আমরা সেখান থেকে খুঁজে খুঁজে কুকুরের ক্রেনি-টিউবটি বের করে আলাদা করে রাখলাম। টিশা সেটা তার পকেটে ভরে নেয়, তারপর আমরা অপেক্ষা করতে থাকি।

কী হবে আমরা জানি না, এক ধরনের উত্তেজনায় আমার বুকটা ধক ধক করতে থাকে।

ঘণ্টা খানেক পর দরজাটা খুলে গেল, ডিটিউন করা মেয়েটি এক ধরনের শূন্য দৃষ্টিতে খাবারের কার্টটা ঠেলে ঠেলে নিয়ে আসতে থাকে। তার পেছনে সশস্ত্র গার্ডটি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি আলগোছে ধরে রেখে একটু এগিয়ে আসে। কয়েকজন খাবার নেওয়ার জন্য কার্টের কাছে এগিয়ে যায়। আমিও তাদের সাথে এগিয়ে গেলাম, সশস্ত্র গার্ডটির কাছে গিয়ে আমি হঠাৎ ঘুরে গার্ডটির হাতে ধরে রাখা অস্ত্রটি খপ করে ধরে ফেললাম।

সশস্ত্র গার্ডটি এর জন্য প্রস্তুত ছিল না, তাকে দেখে মনে হলো সে ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। আমি অস্ত্রটি ছাড়লাম না, সেটা ধরে রেখে হ্যাঁচকা টান দিয়ে তার হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করলাম। গার্ডটিও তার অস্ত্রটি ছাড়ল না—স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে ঝটকা মেরে আমার হাত থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করল। এক ধরনের হুটোপুটি শুরু হয়ে গেল, কিন্তু এরকম অবস্থায় যেটা খুবই স্বাভাবিক—চিৎকার এবং চেঁচামেচি সেটা হলো

না। আমি মুখ দিয়ে কোনো শব্দ করলাম না আর গার্ডটিও এতটুকু উত্তেজিত হলো না, মুখ দিয়ে কোনো শব্দ করল না। আমাদের আশেপাশে যারা ছিল তারা সরে গেল এবং আমি চোখের কোনা দিয়ে দেখতে পেলাম টিশা ক্রেনি-টিউবটি হাতে নিয়ে এগিয়ে আসছে।

টিশাকে সাহায্য করার জন্য আমি গার্ডের পায়ে লাথি মেরে নিচে পড়ে গেলাম, গার্ডটাও আমার উপর পড়ে গেল। অস্ত্রটি আমার বুকের উপর চেপে বসেছে, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। কিন্তু আমি সব সহ্য করে দুই হাতে অস্ত্রটি ধরে নিশ্চল হয়ে রইলাম। গার্ডটি অস্ত্রটি ছিনিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে কিন্তু উঠতে পারছে না। আমি দেখলাম ক্রেনি-টিউবটা হাতে নিয়ে টিশা গার্ডটির পেছনে দাঁড়িয়েছে। তারপর ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে গার্ডের মাথার ক্রেনিয়ালে টিউবটি ঢুকিয়ে দিল।

গার্ডটি প্রথমবার যন্ত্রণার একটা তীব্র চিৎকার করে উঠল, তার সারা শরীর থরথর করে কাঁপতে থাকে। গার্ডটি ধরে রাখা অস্ত্রটি ছেড়ে দিয়ে আমার উপর থেকে গড়িয়ে নিচে পড়ে গেল। দুই হাত আর দুই পা ভাঁজ করে বুকের কাছে এনে গার্ডটি কাঁপতে থাকে। আমি অস্ত্রটি হাতে নিয়ে গার্ডটির দিকে তাক করে ধরে রাখলাম।

আমাদের আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলো দূরে সরে গিয়েছিল, এবার তারা আস্তে আস্তে কৌতূহলী চোখে কাছে এগিয়ে আসে। তাদের মুখ দেখে বোঝা যায় তারা এখনো পুরো বিষয়টা বিশ্বাস করতে পারছে না।

গার্ডটির কাঁপুনি ধীরে ধীরে থেমে যায়, তখন আস্তে আস্তে সে উঠে বসে, হাত এবং পায়ে ভর দিয়ে পশুর মতো সে একটু ঘুরে আসে, নাক দিয়ে মাটিতে শুঁকে তারপর উপরের দিকে মুখ করে অবিকল কুকুরের মতো শব্দ করে করুণ স্বরে ডেকে ওঠে। চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা সবাই অবিশ্বাসের শব্দ করে পেছনে সরে যায়। টিশা সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "এখন তোমাদের বিশ্বাস হয়েছে?"

একজন জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে? এর কী হয়েছে?"

টিশা বলল, "কিছু হয়নি। ওর মাথায় কুকুরের সিস্টেম লোড করা হয়েছে। মানুষটার সাথে এখন একটা কুকুরের কোনো পার্থক্য নেই। গলায় দড়ি বেঁধে কোথাও আটকে রাখ।"

টিশা একটু এগিয়ে গার্ডটার মাথায় হাত রাখল, গার্ডটা তখন অবিকল কুকুরের মতো কুঁই কুঁই শব্দ করে টিশার পায়ের কাছে গুটিশুটি মেরে শুয়ে পড়ল। টিশা গার্ডটার গলায় ঝোলানো কার্ডটা খুলে নিল, পকেটে হাত ঢুকিয়ে সেখানে যা যা আছে পরীক্ষা করার জন্য বের করে আনল।

আমি এগিয়ে একটা প্লেট নিয়ে তার মাঝে কিছু খাবার দিয়ে সেটা গার্ডটার সামনে ঠেলে দিলাম। গার্ডটা উঠে বসে দুই হাত এবং পায়ে ভর দিয়ে বসে খাবারগুলো চেটে চেটে খেতে শুরু করল। দৃশ্যটি অস্বস্তিকর—তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে কেমন যেন শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

ঘরের মাঝে এত কিছু ঘটেছে কিন্তু ডিটিউন করা মেয়েটি তার কিছুই লক্ষ করল না। সে খাবারের কার্টের সামনে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েই রইল, ডানে বা বামে একবার ঘুরেও তাকাল না। আমি টিশাকে বললাম, "টিশা এই ডিটিউন করা মেয়েটিকে ঠিক করার চেষ্টা করা যাক।"

টিশা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। চেষ্টা করে দেখি, কাজ করবে কি না জানি না।"

আমি ক্রেনি-টিউবগুলো থেকে নিউট্রাল টিউবটা বের করে টিশার দিকে এগিয়ে দিলাম। টিশা টিউবটা হাতে নিয়ে ডিটিউন করা মেয়েটির কাছে গিয়ে তার হাতটি ধরল। মেয়েটি টিশার দিকে না তাকিয়েই অন্য হাতটি দিয়ে টিশার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল। টিশা তাকে ছাড়ল না তাকে ধরে রেখে ক্রেনি-টিউবটি তার মাথার পিছনে ক্রেনিয়ালে ঢুকিয়ে দিল। সাথে সাথে মেয়েটির সারা শরীর একটা ঝাঁকুনি দিয়ে থর থর করে কাঁপতে শুরু করে। মনে হতে থাকে সে বুঝি মেঝেতে লুটিয়ে পড়বে। আমি ছুটে

গিয়ে তার অন্য হাতটা ধরে তাকে পড়ে যেতে দিলাম না। মেয়েটির চোখ বন্ধ হয়ে আসে এবং শব্দ করে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে থাকে। আমরা তখন সাবধানে তাকে মেঝেতে বসিয়ে দিলাম। মেয়েটি নিজের হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে ধীরে ধীরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

আমি আর টিশা কী করব বুঝতে পারলাম না। নিউট্রাল টিউবটি ক্রেনিয়ালে লাগিয়ে মেয়েটিকে ঠিক করা গেছে, নাকি আরো খারাপ কিছু হয়ে গেছে আমরা বুঝতে পারছিলাম না। আমি আর টিশা মেয়েটির দুই পাশে বসে অপেক্ষা করতে থাকি।

মেয়েটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে এক সময় মুখ তুলে তাকাল এবং সাথে সাথে আমরা বুঝে গেলাম মেয়েটি আর ডিটিউন করা বোধ শক্তিহীন একটি মানুষ নয়। তার চোখে সেই ভয়ংকর শূন্য দৃষ্টি নেই। তার চোখে এক ধরনের বিস্ময়, কৌতূহল এবং বিষণ্নতা। আমাদের দিকে তাকাল তারপর ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "আমি কোথায়?"

টিশা বলল, "তুমি আমাদের সাথে আছ।"

মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কারা?"

টিশা বলল, "আমার নাম টিশা আর ও হচ্ছে রিহি। "তোমার নাম কী?"

মেয়েটা বলল, "এক সময়ে আমার নাম ছিল লিরিনা।"

টিশা বলল, "লিরিনা, তোমার কী হয়েছিল মনে আছে?"

লিরিনা নামের মেয়েটি মাথা নাড়ল, বলল, "মনে আছে।"

"কী মনে আছে?"

লিরিনা কেমন জানি শিউরে উঠল, বলল, "মনে আছে আমি বিজ্ঞানী লিংলির সাথে কথা বলছি, ঝগড়া করছি, আমি তাকে বলছি, তুমি যত বড় বিজ্ঞানীই হও, তুমি এটা করতে পার না।"

"কী করতে পার না?"

"মানুষকে ব্যবহার করে ক্রেনিপিউটার বানানো।"

"তারপর?"

"তারপর আমাকে ধরে নিয়ে গেল একটা অপারেশন থিয়েটারে। সেখানে আমাকে কী করল আর মনে নেই।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কি জান ক্রেনিপিউটারটা কোথায়?"

লিরিনা এদিক-সেদিক তাকিয়ে বলল, "হ্যাঁ জানি। করিডোর ধরে হেঁটে গেলে একেবারে শেষে।"

"সেখানে পাহারা আছে?"

"না, কোনো মানুষ পাহারা দেয় না। কিন্তু কেউ ভেতরে যেতে পারে না। দরজায় পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে।"

টিশা মাথা নাড়ল, আমি চিন্তিত মুখে বললাম, "আমরা কেমন করে ভেতরে যাব?"

টিশা বলল, "নীল সবুজ চার চার তিন দুই।"

আমি একটু চমকে উঠলাম, নীল সবুজ চার চার তিন দুই হচ্ছে একজন সুপার গণিতবিদের ক্রেনিটিউব। টিশার দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "এই ক্রেনি-টিউব দিয়ে কী পাসওয়ার্ড ভাঙা যাবে?"

"চেষ্টা করতে দোষ কী? লিরিনার ক্রেনিয়ালে লাগাব।"

লিরিনা একটু অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকাল, জিজ্ঞেস করল, "আমার মাথায় কী লাগাবে?"

টিশা একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "তোমাকে আমাদের একটু সাহায্য করতে হবে। তুমি কি সাহায্য করবে?"

লিরিনা একটু হাসার চেষ্টা করল, বলল, "তোমরা আমাকে ডিটিউন থেকে মুক্ত করেছ, অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করব। আমাকে কী করতে হবে বলো।"

"আমাদের ক্রেনিপিউটারের কাছে নিয়ে যাবে। তারপর তোমার ক্রেনিয়ালে একটা ক্রেনি-টিউব লাগিয়ে ক্রেনিপিউটারের কোড ভেঙে আমাদের ভেতরে ঢোকানোর ব্যবস্থা করে দেবে।"

"আমি পারব?"

"নিশ্চয়ই পারবে!"

"ঠিক আছে তাহলে। কখন যেতে চাও?"

"এখনই। দেরি করতে চাই না।"

লিরিনা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "চলো তাহলে যাই।"

টিশা উঠে দাঁড়িয়ে সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমরা যাচ্ছি। আমাদের জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করো যেন আমরা ক্রেনিপিউটার ধ্বংস করে আসতে পারি।"

মানুষগুলো এখন আর আগের মতো হতাশ আর নির্জীব নয়। একজন বলল, "আমি তোমাদের সাথে যেতে চাই।"

তখন এক সাথে অনেকেই বলে উঠল, "আমরাও যেতে চাই।"

আমি বললাম, "এখনই সবার যাওয়া ঠিক হবে না। বাইরে কী আছে আমরা জানি না। আগে আমরা যাই। প্রয়োজন হলে পরে তোমাদের নিতে আসব।"

মানুষগুলো মাথা নাড়ল। বলল, "ঠিক আছে। আমরা তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব।"

কিছুক্ষণের ভেতর আমি আর টিশা লিরিনাকে নিয়ে দরজার কাছে গেলাম। গার্ডের কার্ডটি দরজার সামনে ধরতেই দরজা খুলে গেল।

আমরা ঘরের ভেতর থেকে বের হয়ে এলাম। ভারী স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটা ঘাড়ে নিয়ে আমি আর টিশা লিরিনার পিছু পিছু হাঁটতে থাকি।

সামনে কী আছে জানি না। কী হবে তাও জানি না। হঠাৎ করে মনে হতে থাকে কী হবে তাতে কিছু আসে যায় না! আমাদের চেষ্টা করতে হবে—চেষ্টা করার একটা সুযোগ এসেছে।

১৪.

আমাদের যে ঘরটিতে আটকে রেখেছে তার বাইরে একটা ছোট করিডোর, করিডোরটাতে আধো আলো এবং আধো অন্ধকার। করিডোরের দুই মাথায় যতদূর চোখ যায় কোনো গার্ড নেই। লিংলির এই ক্রেনিপিউটার প্রোজেক্টটি এত নৃশংস এবং অমানবিক যে, সে এটি কারো কাছে প্রচার করতে পারে না। সে যা করতে চায় সেটি গোপনে করতে হয়, তাই খুব বেশি মানুষের সাহায্য নিতে পারে না। নিরাপত্তার জন্য সে মানুষ থেকে বেশি নির্ভর করে যন্ত্রপাতির উপর। মানুষ যাদেরকে রেখেছে তাদের বেশির ভাগকেই ডিটিউন করে রেখেছে। এই ডিটিউন করা মানুষগুলো তাদেরকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া একটি-দুটি কাজ ছাড়া আর কিছু করতে পারে না। এইমাত্র আমরা একটা প্রহরীকে কাবু করে এসেছি, এই প্রহরীটি পুরোপুরি ডিটিউন করা নয়, কিন্তু তারপরেও পুরোপুরি স্বাভাবিক মানুষ মনে হয়নি। সে একটিবারও একটি শব্দ উচ্চারণ করেনি।

লিরিনা করিডোর ধরে হাঁটতে থাকে, তার ঠিক পেছনে টিশা এবং তার থেকে কয়েক পা পেছনে আমি। আমি অস্ত্রটাকে শক্ত করে ধরে রেখেছি, সামনে থেকে হঠাৎ কেউ এলে সে আমাকে অস্ত্র হাতে দেখতে পাবে না এবং আমি কিছু একটা করার সময় পাব।

আমরা লম্বা করিডোর ধরে হেঁটে শেষ মাথায় পৌঁছে যখন লিরিনার পিছু পিছু ডান দিকে হাঁটতে শুরু করেছি ঠিক তখন দেখতে পেলাম, সামনে দিয়ে একজন হেঁটে আসছে। আমি চমকে উঠলাম এবং আমার বুকটা ধক করে উঠল, আমি অস্ত্রটা উঁচু করে ধরলাম,

যদি গুলি করতে হয় গুলি করব, কিন্তু আমি কখনো কোনো মানুষকে গুলি করিনি। মানুষকে হত্যা করা মোটেও সহজ কিছু নয়।

লিরিনা বলল, "ভয় নেই। এটি একজন ডিটিউন করা মানুষ।" আমি বুকে আটকে থাকা একটা নিঃশ্বাস বের করে অস্ত্রটা নিচে নামিয়ে আনি। ডিটিউন করা মানুষটি শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আমাদের পাশ দিয়ে হেঁটে গেল।

আমরা আরো দুটি করিডোর পার হয়ে সামনে এগিয়ে যাবার সময় প্রথমবার আরেকজন সশস্ত্র প্রহরীর দেখা পেলাম। মানুষটি লিরিনাকে দেখে খানিকটা আশ্বস্ত হয়েছিল কিন্তু তার পেছনে টিশাকে আর আমাকে দেখে চমকে উঠল। কোনো কথা না বলে সে তার অস্ত্রটা আমাদের দিকে তাক করে ধরল, টিশা ফিসফিস করে বলল, "গুলি কর রিহি।"

আমি কাঁপা গলায় বললাম, "আমি কখনো কোনো মানুষকে গুলি করিনি।"

টিশা বলল, "কোনো ভয় নেই। তোমার অস্ত্রটি কোনো মানুষকে মেরে ফেলবে না। এটা ট্রাংকিউলাইজারে সেট করা। মানুষটি অচেতন হয়ে যাবে।"

আমি আর দেরি না করে গার্ডটাকে গুলি করলাম, "ধুপ" করে একটা চাপা শব্দ হলো আর সাথে সাথে মানুষটা একটু কেঁপে উঠে একটা আর্ত শব্দ করল। এক ধরনের বিস্ফারিত চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর ঘুরে গিয়ে হাঁটু ভেঙে নিচে পড়ে গেল।

টিশা ছুটে গিয়ে গার্ডের গলায় ঝোলানো ব্যাজটা খুলে নিয়ে তার অস্ত্রটা হাতে নিয়ে বলল, "চমৎকার! এখন আমাদের দুটি অস্ত্র! আরো একজন গার্ডের সাথে দেখা হলে আমাদের তিনটি অস্ত্র হয়ে যাবে, আমরা তখন পুরোপুরি সশস্ত্র একটা দল হয়ে যাব।"

আমি বললাম, গার্ডটাকে লুকিয়ে ফেলা দরকার। টিশা বলল, "কোথায় লুকাবে?"

লিরিনা বলল, "কাছেই একটা ইউটিলিটি ঘর আছে, আমরা সেখানে লুকিয়ে ফেলতে পারি।"

তখন আমরা ধরাধরি করে গার্ডটাকে ইউটিলিটি ঘরে লুকিয়ে ফেলে আবার তিনজন হাঁটতে শুরু করলাম। আমি টিশাকে জিজ্ঞেস

করলাম, "আমার অস্ত্রটা যে ট্রাংকিউলাইজারে সেটা করা সেটা তুমি কখন দেখলে?"

টিশা বলল, "আমি দেখিনি।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "তাহলে?"

"আমি অনুমান করেছিলাম, জীবিত মানুষ লিংলির কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। লিংলি কখনোই কাউকে মেরে ফেলতে চাইবে না। তাই ধরে নিয়েছিলাম অস্ত্রটা নিশ্চয়ই ট্রাংকিউলাইজারে সেটা করা থাকবে।"

"যদি না থাকত?"

"তাহলে একটু আগে তুমি জীবনে প্রথম একটা মানুষ খুন করতে। বিপদের সময় অনেক কিছু করতে হয়।"

আমি কোনো কথা বললাম না। টিশা খুবই বিচিত্র মেয়ে, তাকে বোঝা খুব কঠিন।

লিরিনা আমাদেরকে নিয়ে হেঁটে হেঁটে একটা খাড়া দেয়ালের সামনে হাজির হলো। আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "এটা ক্রেনিপিউটার।"

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "এটা?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু এখানে ঢুকব কেমন করে?"

লিরিনা বলল, "জানি না।"

টিশা খুব মনোযোগ দিয়ে দেয়ালটি লক্ষ করে, সেটার উপরে হাত বুলায় কিন্তু ভেতরে ঢোকার মতো কিছু খুঁজে পায় না। তখন একটু আগে গার্ডের গলায় ঝোলানো যে ব্যাজটি টিশা খুলে এনেছে সেটা দেয়ালের উপর রেখে ডানে বামে নাড়তে থাকে এবং হঠাৎ করে ঘরঘর শব্দ করে দেয়ালটি সরে গিয়ে ভেতরে ছোট একটি ঘর বের হয়ে আসে। টিশার মুখে হাসি ফুটে উঠল, বলল, "চমৎকার।"

ছোট ঘরটিতে ঢোকার পর দরজাটা নিজে থেকে বন্ধ হয়ে গেল—সেটি একদিক থেকে ভালো, হঠাৎ করে কেউ চলে এলে আমাদের দেখতে পাবে না।

সামনে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি, দূর থেকে আমাদের কেউ দেখছে কি না বুঝতে পারছিলাম না। দেখতে পেলেও কিছু করার নেই।

আমাদের কাছে এমন দুটি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র, দরকার হলে ছোটখাটো যুদ্ধ করা যাবে।

টিশা লিরিনাকে সামনের দরজাটা দেখিয়ে বলল, "লিরিনা, তোমাকে এই দরজাটা খুলে দিতে হবে।"

লিরিনা একটু ইতস্তত করে বলল, "কীভাবে?"

"দরজার প্যানেলে পাসওয়ার্ডটি ঢোকাতে হবে।"

লিরিনা দুর্বলভাবে হেসে বলল, "পাসওয়ার্ডটি আমাকে বের করতে হবে?"

টিশা মাথা নেড়ে তার পকেট থেকে একটা ক্রেনি-টিউব বের করে তার কোডটি পড়ে নিশ্চিত হয়ে বলল, "তোমার ক্রেনিয়ালে এটা ঢোকানো হলে তুমি অসাধারণ একজন গণিতবিদ হযে যাবে। তখন হয়তো পাসওয়ার্ডটি বের করতে পারবে।"

"যদি না পারি?"

"তাহলে আমাদের অস্ত্র দিয়ে গুলি করে দরজা ভেঙে ফেলব। কিন্তু আগেই সেটা করতে চাই না। যত সম্ভব কম হৈ চৈ করে ক্রেনিপিউটারে ঢুকতে চাই।"

লিরিনা বলল,"ঠিক আছে, বানাও আমাকে গণিতবিদ।"

টিশা লিরিনার মাথায় সাবধানে ক্রেনি-টিউবটা ঢুকিয়ে দিল। লিরিনা কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রইল, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে চোখ খুলে তাকাল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "সবকিছু ঠিক আছে?"

লিরিনা বলল, "হ্যাঁ ঠিক আছে। কিন্তু বুঝতে পারছি মাথার ভেতর কিছু একটা হয়ে গেছে। সবকিছু কেমন যেন ধোঁয়ার মতো লাগছে। সংখ্যা ছাড়া আর কিছু দেখছি না।"

টিশা লিরিনার হাত ধরে বলল, "আমরা মোটেও তোমাকে এই অবস্থায় বেশিক্ষণ রাখব না। তুমি একটু চেষ্টা করে দেখো পাসওয়ার্ডটি ডিকোড করতে পার কি না—যদি না পার ক্ষতি নেই, এক্ষুনি আবার তোমার মাথায় নিউট্রাল টিউব দিয়ে তোমাকে ঠিক করে দেব।"

লিরিনা কোনো কথা বলল না, ভুরু কুঁচকে দরজার প্যানেলের দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখে-মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে এবং মুখটি কেমন যেন লালচে হয়ে আসতে থাকে। সে দুই হাত দিয়ে তার

মাথার চুলে হাত ঢুকিয়ে চুলগুলো এলোমেলো করতে থাকে এবং তাকে দেখে আমাদের কেমন যেন ভয় করতে থাকে।

টিশা বলল, "লিরিনা, তোমার কী কষ্ট হচ্ছে? তাহলে থাকুক আমরা গুলি করে দরজা ভেঙে ফেলি।"

লিরিনা বলল, "না, আগে একটু চেষ্টা করে দেখি।"

লিরিনা দরজার সামনে গিয়ে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। সে কিছুক্ষণ সংখ্যার প্যানেলটির দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর সেটার উপর আলতো করে হাত বুলালো। তারপর হঠাৎ প্রায় ঝড়ের বেগে কিছু সংখ্যা প্রবেশ করিয়ে আবার কিবোর্ডের দিকে তাকিয়ে রইল, হাত দিয়ে স্পর্শ করল এবং চোখ বন্ধ করে ফেলল। এরপর চোখ বন্ধ অবস্থাতেই সে প্যানেলের কিবোর্ডে খুব দ্রুত কিছু সংখ্যা প্রবেশ করায়, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তারপর আবার কিবোর্ডে সংখ্যা প্রবেশ করায়। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, আবার দ্রুত কিছু সংখ্যা প্রবেশ করিয়ে ভারী দরজার মাঝে কান লাগিয়ে কিছু শোনার চেষ্টা করে।

টিশা বলল, "তুমি কী করছ লিরিনা? যদি সমস্যা হয় বলো, গুলি করে দরজা ভেঙে ফেলি।"

লিরিনা কথা শুনতে পেল কি না বুঝতে পারলাম না। সে কিছুক্ষণ দরজাটার দিকে তাকিয়ে খুব সাবধানে একটা একটা করে সংখ্যা প্রবেশ করাতে থাকে এবং কী আশ্চর্য হঠাৎ করে দরজাটা খুলে যায়। সাথে সাথে লিরিনাও মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে গেল।

আমি আর টিশা ছুটে গিয়ে লিরিনাকে ধরলাম, টিশা আতঙ্কিত হয়ে ডাকল, "লিরিনা! লিরিনা!"

লিরিনা চোখ খুলে তাকাল, ফিসফিস করে বলল, "আমাকে একটু বিশ্রাম নিতে দাও।"

আমরা ভয় পাচ্ছিলাম দরজাটা না আবার বন্ধ হয়ে যায়। দরজাটা বন্ধ হলো না এবং লিরিনা কয়েক সেকেন্ড পর উঠে বসে বলল, "চলো, যাই।"

টিশা বলল, "তোমার ক্রেনিয়ালে নিউট্রাল টিউব দিয়ে তোমাকে ঠিক করে দিই?"

লিরিনা বলল, "আগে ভেতরে ঢুকে যাই, তারপর।"

আমরা ভেতরে ঢুকে গেলাম এবং তিনজন একসাথে আর্তনাদ করে উঠলাম।

ভেতরে বিশাল একটা হলঘর এবং সেখানে অসংখ্য মানুষের নগ্ন দেহ ছাদ থেকে ঝুলছে। সূক্ষ্ম এক ধরনের তার দিয়ে শরীরটাগুলো ঝোলানো হয়েছে, দেখে মনে হয় বুঝি মানুষগুলো শূন্যে ঝুলছে। মানুষগুলোর মাথার পেছন থেকে ইলেকট্রিক ক্যাবল বের হয়ে এসেছে। তাদের নাকের ভেতরে এক ধরনের নল। মুখের ভেতরে আরেকটি নল এবং শরীরের ভেতরে নানা জায়গায় ছোট-বড় নল লাগানো। কোনো কোনো নলের ভেতর দিয়ে শরীরের ভেতর এক ধরনের তরল পদার্থ ঢুকে যাচ্ছে। কোনো কোনো নলের ভেতর দিয়ে তাদের শরীর থেকে কিছু একটা বের করে নেওয়া হচ্ছে। হলঘরে যন্ত্রের এক ধরনের চাপা গুঞ্জন এবং সবচেয়ে যেটি ভয়ংকর সেটি হচ্ছে তীব্র এক ধরনের অপরিচিত অস্বস্তিকর গন্ধ।

আমরা হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম, মনে হতে লাগল বুঝি ভুল করে নরকের ভেতর এসে ঢুকে পড়েছি। ছাদ থেকে তার দিয়ে ঝোলানো মানুষগুলোর মুখে যন্ত্রণার এক ধরনের অভিব্যক্তি। তাদের চোখ বন্ধ, কিন্তু মাঝে মাঝেই তাদের চোখ খুলে যাচ্ছিল কিন্তু সেই চোখে তারা কিছু দেখছিল বলে মনে হয় না। হঠাৎ হঠাৎ তাদের সারা শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে উঠছিল এবং মাঝে মাঝে তাদের গলা দিয়ে ঘর ঘর করে এক ধরনের শব্দ বের হচ্ছিল। যতদূর চোখ যায় ততদূর পর্যন্ত মানুষের দেহ। নারী-পুরুষ এবং কিশোর-কিশোরী। তাদের শরীরে একধরনের অপুষ্টির চিহ্ন, গায়ের রং বিবর্ণ। কারো মাথায় কোনো চুল নেই।

আমি অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত রাখলাম। তারপর টিশার দিকে তাকিয়ে বললাম "টিশা।"

"বলো রিহি।"

"আমরা এখন কী করব?"

"মানুষগুলোর বাই-ক্রেনিয়াল থেকে ক্যাবলগুলো খুলে নিতে হবে।"

"এতগুলো মানুষ, একটা একটা করে খুলতে অনেক সময় নেবে। তা ছাড়া—"

"তা ছাড়া কী?"

আমি বললাম, "বাই-ক্রেনিয়ালগুলো অন্যরকম, মনে হয় মস্তিষ্কের ভেতর পাকাপাকিভাবে কানেকশন দেওয়া—টান দিয়ে মনে হয় না খোলা যাবে।"

টিশা কাছাকাছি ঝুলে থাকা একজন মানুষকে ভালো করে পরীক্ষা করে বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ। এখানে কানেকশন পাকাপাকিভাবে দেওয়া।"

"তাহলে কী করব?"

"মনে হয় ইলেকট্রিক কানেকশনটা খুঁজে বের করে সেটা নষ্ট করতে হবে।"

আমি বিশাল হলঘরটার দিকে তাকালাম, অসংখ্য মানুষের মাথা থেকে বাই-ক্রেনিয়াল কানেকশন দিয়ে ইলেকট্রিক তারগুলো বের হয়ে এসেছে, কোনটা কোনদিকে গিয়েছে বোঝার উপায় নেই। এখান থেকে কানেকশন বের করা প্রায় অসম্ভব একটি ব্যাপার। আমি তারপরও চেষ্টা করতে থাকি। ঝুলিয়ে রাখা মানুষগুলোর মাথা থেকে বের হওয়া ইলেকট্রিক ক্যাবলগুলো কোনদিকে গিয়েছে খুঁজে বের করে সেটাকে লক্ষ করে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলাম।

তখন লিরিনা আমাকে থামাল, বলল, "রিহি।"

"বলো লিরিনা।"

"তোমরা আমাকে দুই মিনিট সময় দাও, আমি এই নেটওয়ার্কের সেন্ট্রাল নোডটা বের করে দিই।"

"তুমি পারবে?"

"অন্য সময় হলে পারতাম না। এখন মনে হয় পারব।"

লিরিনা মানুষগুলোর ভেতর দিয়ে হাঁটতে থাকে, তারগুলো লক্ষ করে, মনে মনে কিছু হিসাব করে তারপর হেঁটে হেঁটে মাঝামাঝি একটা জায়গায় থেমে গিয়ে আমাদের ডাকল। বলল, "টিশা আর রিহি। এদিকে এসো।"

আমরা ঝুলন্ত মানুষগুলোর ফাঁক দিয়ে হেঁটে লিরিনার কাছে গেলাম। লিরিনা হাত দিয়ে দেয়ালের একটা চতুষ্কোণ বাক্স দেখিয়ে

বলল, "এই যে এখানে সবগুলো তার এসেছে। এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল নোড।"

টিশা বলল, "তার মানে এখান থেকে সবার মস্তিষ্কে সিগন্যাল পাঠানো হয়, আবার সবার মস্তিষ্ক থেকে সিগন্যাল নিয়ে এখানে জমা করা হয়? প্রক্রিয়া করা হয়?"

"হ্যাঁ।"

"তার মানে এটা ধ্বংস করলে পুরো ক্রেনিপিউটার ধ্বংস হয়ে যাবে?"

"হ্যাঁ! মানুষগুলোকে বাঁচিয়ে রেখে ক্রেনিপিউটার ধ্বংস করার এটাই সবচেয়ে সহজ উপায়।"

টিশা এবারে কোনো কথা না বলে হাতের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটা তুলে ধরে দেয়ালের চৌকোনা বাক্সটা লক্ষ করে গুলি করতে শুরু করে। প্রথম গুলিতেই সেটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল কিন্তু টিশা থামল না, হিংস্র মুখে সেটাকে গুলি করতে থাকল এবং গুলির ভয়ংকর শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে হলঘরে ফিরে আসতে থাকল।

আমি টিশার ঘাড়ে হাত রেখে বললাম, "টিশা, থামো। এটা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। আর কেউ এটাকে ঠিক করতে পারবে না।"

টিশা থামল, আমার দিকে তাকাল, তারপর বলল, "এখন আমার মরে গেলেও দুঃখ নেই।"

আমি বললাম, "না টিশা। এখন মরে যেতে পারবে না। এই মানুষগুলোকে বাঁচাতে হবে। লিংলিকে ধরিয়ে দিতে হবে। তারপর বলতে পার, মরে গেল দুঃখ নেই। এর আগে মরে গেলে অনেক দুঃখ থাকবে।"

কে যেন গমগমে গলায় বলল, "তোমাদের সেই দুঃখ নিয়েই মারা যেতে হবে।"

আমরা চমকে উঠলাম, মাথা ঘুরিয়ে সামনে তাকিয়ে দেখি বিজ্ঞানী লিংলি, তার হাতে একটা বেঢপ অস্ত্র। আমাদের দিকে তাকিয়ে অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, "আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না তোমরা আমার এত বড় ক্ষতি করতে পেরেছ। পুরো শহরটা এই ক্রেনিপিউটার নিয়ন্ত্রণ করত—এখন পুরো শহরটা

নিয়ন্ত্রণহীন। তোমাদের জন্য।" হিংস্র গলায় চিৎকার করে বলল, "শুধুতোমাদের জন্য।"

আমি হাতের অস্ত্রটা সোজাসুজি লিংলির দিকে তাক করে বললাম, "আমি কখনো কোনো মানুষ খুন করিনি। সব সময়েই মনে হতো কাজটা খুব কঠিন। কিন্তু বিজ্ঞানী লিংলি—কিংবা দানব লিংলি, তোমাকে খুন করার জন্য গুলি করতে আমার হাত এতটুকু কাঁপবে না।"

লিংলি বলল, "তাতে কিছু আসে যায় না নির্বোধ ছেলে। তোমাদের অস্ত্র থেকে এখন কোনো গুলি বের হবে না, আমি এইমাত্র সেইগুলো অকেজো করে দিয়েছি। বিশ্বাস না করলে আমাকে গুলি করার চেষ্টা করে দেখ।"

আমি চেষ্টা করলাম, খট করে একটা শব্দ হলো কিন্তু আর কিছু হলো না। বিজ্ঞানী লিংলি এক পা পিছিয়ে বলল, "এই ছেলে আর মেয়ে, তোমরা আমার মানুষগুলোর সামনে থেকে সরে এসো। আমি যখন গুলি করব তখন মানুষগুলোর কোনো ক্ষতি করতে চাই না। আমাকে আবার ক্রেনিপিউটার দাঁড়া করাতে হবে। মানুষগুলো আমার দরকার।"

আমি আর টিশা যেখানে ছিলাম সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। লিংলি বলল, "ঠিক আছে। তাহলে যেখানেই আছ সেখানেই থাকো, আমি ট্রাংকিউলাইজার দিয়ে গুলি করি। যখন তোমাদের জ্ঞান হবে তখন দেখবে, আমার ক্রেনিপিউটারের মানুষগুলোর পাশে তোমরা দুজনও কার্বন ফাইবারের তার দিয়ে ছাদ থেকে ঝুলছ।"

লিংলির মুখে একটা বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে এবং সে তার মুখের ভয়ংকর হাসিটি ধরে রেখে ট্রিগারে হাত দিল। আমি আর টিশা স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। বিজ্ঞানী লিংলি দেখতে পাচ্ছে না কিন্তু আমরা দেখছি খোলা দরজা দিয়ে আমাদের সাথে থাকা মানুষগুলো নিঃশব্দে ঢুকছে। সবার সামনে থাকা মাঝবয়সী মানুষটির হাতে একটা ধাতব দণ্ড, সে পেছন থেকে লিংলির মাথায় আঘাত করার জন্য দণ্ডটি মাথার উপরে তুলেছে।

লিংলি আগে গুলি করেছে নাকি মানুষটি লিংলির মাথায় আগে আঘাত করেছে আমরা জানি না, কিন্তু গুলির শব্দের সাথে সাথে

দেখতে পেলাম লিংলি হাঁটু ভেঙে নিচে পড়ে গেল। গুলিটা আমাদের গায়ে লাগল না। ছাদের কোথাও আঘাত করে কিছু প্যানেল ভেঙ্গে নিচে এসে পড়ল। ধাতব দণ্ড হাতে মানুষটি কিছুক্ষণ লিংলির অচেতন দেহের দিকে তাকিয়ে থাকল তারপর টিশার দিকে তাকিয়ে বলল, "মেয়ে, তোমার নামটি ভুলে গেছি।"

"টিশা।"

"টিশা, তুমি যখন বলেছিলে আমাদের সবাইকে মুক্ত করবে তখন আমি তোমার কথা বিশ্বাস করিনি। তোমাকে আমি যথেষ্ট গুরুত্ব দিইনি, তুমি কিছু মনে করো না। আমাকে মাফ করে দিয়ো।"

টিশা কোনো কথা বলল না। মানুষটি বলল, "টিশা, মা, তোমার মতো আমার একটি মেয়ে ছিল।"

টিশা জিজ্ঞেস করল; "সে কোথায়?"

"জানি না, একদিন হারিয়ে গেল।"

লিরিনা পাশে দাড়িয়ে ছিল সে একটু এগিয়ে এসে বলল, "তোমার মেয়ে হারিয়ে যায়নি।"

মানুষটি চমকে উঠল, বলল, "সে কোথায়?"

লিরিনা বলল, "সে এখানেই আছে। সবার হারিয়ে যাওয়া ছেলে আর মেয়ে এখানে আছে।"

মানুষটি কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, "তুমি কেমন করে জান?"

লিরিনা বলল, "আমি জানি। আমি এখানে কাজ করেছি। আমাকে ডিটিউন করার আগে আমি লিংলির সহকারী ছিলাম।"

আমরা হঠাৎ করে বাইরে অনেক মানুষের কোলাহল শুনতে পেলাম। ক্রেনিপিউটার ধ্বংস হবার পর মানুষ হঠাৎ করে কিছু একটা বুঝতে পেরেছে। তারা সবাই আসছে।

আমি টিশার দিকে তাকালাম, টিশা আমার দিকে তাকাল, ফিসফিস করে বলল, "আমাদের কাজ শেষ।"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "হ্যাঁ টিশা। আমাদের কাজ শেষ।"

শেষ পর্ব

লিংলির তৈরি করা ক্রেনিপিউটারে ঝুলিয়ে রাখা মানুষদের একজন একজন করে নামিয়ে তাদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। জ্ঞান ফিরিয়ে আনার আগে খুব সাবধানে তাদের মস্তিষ্ক থেকে বাই-ক্রেনিয়াল খুলে নিতে হয়েছিল। কাজটি খুব সহজ ছিল না, সেটি করার সময় দুজন মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে মারা গেছে। প্রায় দশজনের মস্তিষ্কের কম-বেশি ক্ষতি হয়েছে—অন্যেরা বেশ ভালোভাবেই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছে। ক্রেনিপিউটারে একটা প্রসেসর হিসেবে কাজ করার সময়টুকুর কোনো স্মৃতি তারা মনে করতে পারে না—এক দিক দিয়ে সেটি ভালো। সেই বিভীষিকার স্মৃতি দিয়ে তারা কী করবে?

শহরের অনেক মানুষের রহস্যময়ভাবে হারিয়ে যাওয়া সন্তানদের এখানে খুঁজে পাওয়া গেছে। লিরিনার কথা সত্যি। লিংলির বন্দিশালার মধ্যবয়স্ক মানুষটিও তার মেয়েকে খুঁজে পেয়েছে। আমি আর টিশা আমাদের শহরের লুক আর হুনাকেও খুঁজে পেয়েছি, সত্যি কথা বলতে কি, প্রথমে আমরা তাদের চিনতে পারিনি, মাথায় চুল নেই, বিবর্ণ চেহারা, বিভ্রান্ত দৃষ্টি। হাসপাতালের সারি সারি বিছানায় তারা শুয়ে ছিল, আমাদের দেখে তাদের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। টিশা অবাক হয়ে বলল, "তোমরা লুক আর হুনা না?"

দুজনেই তখন খুবই দুর্বল, কথা বলার শক্তি নেই, তার মাঝে মাথা নাড়ল। টিশা তাদের হাত ধরে বলল, "তোমাদের আর কোনো ভয় নেই। শুধু তোমরা যে বেঁচে যাবে তাই নয়—আমাদের শহরের সব ডিটিউন করা ছেলেমেয়েও ভালো হয়ে যাবে। তাদেরকে কেমন করে ভালো করা যায় আমরা এখন জানি।"

লুক আর হুনা কোনো কথা বলল না, শুধু তাদের চোখ থেকে দুই ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ল।

শহরের মানুষজন যখন বিজ্ঞানী লিংলির তৈরি করা ক্রেনিপিউটার দেখতে পেল তখন তারা বিস্ময়ে এবং আতঙ্কে একেবারে হতবাক হয়ে গেল। তাদের শহরে এত ভয়ংকর একটি ঘটনা ঘটছে অথচ তারা কিছু জানে না। এ নিয়ে শহরের মানুষজনের ভেতর তীব্র এক ধরনের অপরাধবোধের জন্ম নিয়েছিল। শহরের মানুষ দাবি করল, বিজ্ঞানী লিংলিকে প্রকাশ্যে সবার সামনে বিচার করে শাস্তি দিতে হবে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্যি তাকে বিচার করতে হয়নি কিংবা শাস্তিও দিতে হয়নি। সে নিজেই নিজের শাস্তি দিয়েছিল। তার সেলের ভেতর ছাদ থেকে একটা কার্বন ফাইবার ঝুলিয়ে গলায় ফাঁস নিয়েছিল। সূক্ষ্ম ফাইবার তার গলার চামড়া কেটে বসে যে বীভৎস দৃশ্য তৈরি করেছিল, তার সাথে হয়তো তার নিজের তৈরি ক্রেনিপিউটারেরই শুধু মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব। আত্মহত্যা করার আগে আমি আর টিশা একবার তার সাথে কথা বলতে গিয়েছিলাম, সে খুব স্বাভাবিকভাবে আমাদের সাথে কথা বলেছে, ক্রেনিপিউটারের জন্য তার মনে বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ক্রেনিপিউটারে মানুষগুলোকে কেন কার্বন ফাইবার দিয়ে শূন্যে ঝুলিয়ে রেখেছিল। সে খুবই স্বাভাবিক গলায় বলেছিল, অল্প জায়গায় অনেক মানুষকে রাখার সেটা সবচেয়ে সহজ উপায়। ঝুলে থাকে বলে চারদিক থেকে আলো বাতাস পায় এবং দেহটি সুস্থ থাকে, বিছানায় শুয়ে থেকে থেকে চামড়ায় পচন ধরে না। তার কথা শুনে আমি আর টিশা হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

আমাদের শহরের মানুষেরা আমাকে আর টিশাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। সবকিছু শুনে তারা আমাদেরকে সেই শহরের কমান্ড্যান্টের দায়িত্ব দিতে চায়। আমরা রাজী হইনি, শুধু মাত্র ডিটিউন করা ছেলে মেয়েগুলোকে ঠিক করে দেয়ার জন্যে একটা নিউট্রাল টিউব পাঠিয়ে দিয়েছি। কুনিল ঠিক হয়ে তার মায়ের সাথে কথা বলছে, ব্যাপারটা চিন্তা করেই আমরা এক ধরনের আনন্দ পাই।

লিংলিকে ধরিয়ে দিয়ে ক্রেনিপিউটার ধ্বংস করার জন্য এই শহরের মানুষেরা আমাকে আর টিশাকে গভীর এক ধরনের ভালোবাসা দিয়ে গ্রহণ করেছিল। কমবয়সী ছেলেমেয়েদের সাথে পার্কে পানির ধারে বসে আমরা অনেক গল্প-গুজব করে নেচে গান গেয়ে সময় কাটিয়েছি। ঠিক কী কারণ জানা নেই কিন্তু এত আনন্দে থাকার পরও আমার আর টিশার ভেতরে এক ধরনের অস্থিরতার জন্ম নিল। অস্থিরতাটুকু আরো বেড়ে গেল যখন মায়ী মায়ীর দস্যুদল শহরটিতে হানা দিল।

তবে দস্যুদলের এই আক্রমণটুকু ছিল খুবই বিস্ময়কর, কারণ দস্যুদলের নেতা এখন আর মায়ী মায়ী নয়—দস্যুদলের নতুন নেতা আমাদের রিয়ানা! এই দস্যুদল এখন শহরে শহরে আক্রমণ করে লুটপাট করে না, কাছাকাছি সবাই মিলে কনসার্টের আয়োজন করে, সবাইকে গান শোনায়। তাদের মূল গায়ক হচ্ছে মায়ী মায়ী। নেচে কুদে সে যখন গান গায় দৃশ্যটি দেখার মত। এরকম একটা বিচিত্র পরিবর্তন কীভাবে সম্ভব আমি আর টিশা রিয়ানাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। রিয়ানা বলেছে তার মূলে ছিল আমাদের দিয়ে আসা নিউট্রাল ক্রেনিয়াল টিউবটি! সেটা দিয়ে সে একজন একজন দস্যুকে ভালো মানুষে তৈরি করে নিয়েছে। এখনো তাদের বিশাল অস্ত্রসম্ভার, এখনো তারা দরকার হলে অন্য দস্যুদলের সাথে যুদ্ধ করে, কিন্তু সেটি করা হয় শুধু মাত্র জোর করে তাদের ক্রেনিয়ালে নিউট্রাল টিউব ঢুকিয়ে ভালো মানুষ করে ফেলার জন্য। কী আশ্চর্য!

রিয়ানা আমাদের দুজনকে তাদের দলে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, আমরা বিনয়ের সাথে সেটি প্রত্যাখ্যান করেছি, কিন্তু আমাদের ভেতর অস্থিরতাটুকু আরো বেড়ে গেছে। বিশাল কনসার্ট করে রিয়ানার দল চলে যাবার পর একদিন আমি আর টিশা ঠিক করলাম আমরাও চলে যাব। আমরা ঠিক করেছিলাম যাযাবর হয়ে ঘুরে বেড়াব, সেটাই ছিল আমাদের জীবনের সবচেয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত।

আমাদের কেউ চলে যেতে দিতে চাইছিল না কিন্তু যখন বুঝতে পারল আমরা আসলেই চলে যাব, তখন শহরের মানুষেরা একদিন আমাদের দুজনকে বিদায় দিল।

আমি আর টিশা যখন দরকারি কিছু জিনিসপত্র নিয়ে আমাদের মোটর বাইকে বসেছি তখন হঠাৎ করে লক্ষ করলাম, সোনালি চুলের একটি মেয়ে তার বাইকে করে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটিকে আমরা ভালোভাবে চিনি, হাসিখুশি ছটফটে মেয়ে, খুব সুন্দর গান গাইতে পারে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

মেয়েটি মুখের উপর থেকে তার সোনালি চুলগুলো পেছনে সরিয়ে বলল, "তোমাদের সাথে।"

আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, "আমাদের সাথে?"

"হ্যাঁ।" মেয়েটি মাথা নাড়ল, বলল, "আমিও যাযাবর হয়ে যাব।"

"তুমিও যাযাবর হয়ে যাবে?"

মেয়েটি মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। আমি একা না। ঐ তাকিয়ে দেখো।"

আমি পেছনে তাকালাম, দেখলাম, অসংখ্য তরুণ-তরুণী মোটর বাইকে করে আসছে, এরা সবাই আমাদের সাথে যাযাবর হয়ে যেতে চায়!

এই কমবয়সী তরুণ-তরুণীগুলোকে নিয়ে আমরা নিজেরা একটা আনন্দময় শহর গড়ে তুলেছি। সবাইকে নিয়ে থাকতে গিয়ে আমরা আবিষ্কার করেছি প্রত্যেকটা ছেলে কিংবা মেয়ে নিজের মতন, মানুষের ভেতরকার এই বৈচিত্র্যটাই মনে হয় মানুষের সবচেয়ে বড় শক্তি। সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য।

ছেলেমেয়েগুলো সবাই আলাদা, কারো সঙ্গে কারো কোনো মিল নেই। শুধু একটা ব্যাপারে সবার মাঝে একটা মিল আছে।

এখানে কারো মাথায় কোনো ক্রেনিয়াল নেই!